ادبیات کی بنیادیں

ڈاکٹر ابو سعید نور الدین

চিরায়ত গ্রন্থমালা

'সমস্ত রুশ সাহিত্যিককে মিলিয়েছে একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা—বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ, তার জনগণের ভবিতব্য, বিশ্বে তার ভূমিকা ... রুশ সাহিত্যিকদের হৃদয় যেন ভালোবাসার ঘণ্টা, তার দিব্যোদাত্ত ধ্বনি পৌঁছিয়েছে সমস্ত জীবন্ত হৃদয়েই।'

মাক্সিম গোর্কি

আলোকিত মানুষ চাই

রুশ গল্প সংকলন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৮৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

পঞ্চম সংস্করণ দশম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
[প্রগতি প্রকাশন মস্কো থেকে প্রকাশিত রুশগল্প সংকলন
বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলোই এ বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে]

মূল্য
একশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0184-1

ROOSH GALPO SHANKOLON
A collection of Russian stories
Introduction by Shaokat Hossain
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 180.00 only

ভূমিকা

রুশ-সাহিত্যিকগণ স্ব স্ব দেশকালের গভীরে প্রবেশ করে জগৎ ও জীবনের সুমহান তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। এঁরা কেবল আপন দেশেরই নন, বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখকও।

অতীত রাশিয়া শিল্পসমৃদ্ধ ছিল না। অভিজাতদের ঐশ্বর্যের যোগান আসত শুধু জমির আয় থেকে। বহু শতাব্দীব্যাপী চলেছিল ভূমিদাস-প্রথা। শ্রেণি-বৈষম্যে শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে পড়েছিল পুরো সমাজ। ভ্রান্ত মূল্যবোধে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে মানুষের ভেতরের খাঁটি গুণগুলো স্ফুরিত হতে পারত না।

১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটে; ভাঙন-ধরা জমিদারদের দিন-ফুরিয়ে-আসা আভিজাত্যের ধ্বংস ও নিঃস্বতার বিষণ্ন ছবি তখনকার রুশ সাহিত্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছিল। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালের বিপ্লব দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল রুশ সাহিত্যজগৎ।

সমগ্র রুশ সাহিত্যে ছোটগল্প এক উল্লেখযোগ্য ধারা। উপন্যাস ও কবিতার সমান্তরালে রুশ ছোটগল্পেও দেখা যায় প্রাকবিপ্লবকালের নিরন্ন জর্জরিত কৃষক, লোলুপ নিষ্ঠুর কুলাক এবং ভূমিদাস-প্রথা ধ্বংস-পরবর্তী মতিভ্রষ্ট অভিজাত জমিদারদের করুণ নির্মম সত্যাশ্রয়ী বিবরণ। রুশি ছোটগল্প লোক-ইতিহাসের জীবন্ত, বর্ণাঢ্য, সত্যগর্ভ এক-একটি টুকরো যা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে তুলে ধরে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, উপকথা, লোকগাথা ও গান— সকল উৎস থেকে সাহায্য নিয়ে গল্পকারেরা তাঁদের জাতীয় জীবন ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন এক-একটি গল্পে। প্রামাণিকভাবে সেখানে ফুটে উঠেছে বনেদি মনিব ও তাদের বংশধরদের বিরামহীন রুষ্টতা ও নির্মমতা এবং অভিজাত জমিদার অথবা ছোট জমিদারদের দরিদ্র মানুষের প্রতি তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনার খিটখিটে চরিত্র।

রাশিয়ার ইতিহাস থেকে চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজস্ব সময়কে খুঁড়ে খুঁড়ে প্রতিটি রুশ গল্পই মানবেতিহাসের অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি হিসেবে বিশ্বজুড়ে আত্মাবিষ্কৃতির পথকে প্রসারিত করেছে। সোভিয়েত জনগণের হাতে ফ্যাসিজমের ধ্বংস এবং ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি প্রত্যেক গল্পশিল্পীর মনে যে কতটা প্রচণ্ডভাবে রেখাপাত করেছিল সোভিয়েত গল্পে তার স্বচ্ছ তির্যক নিরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। রাশিয়ার খ্যাতনামা সমালোচক ন.ক.মিখাইলভস্কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— 'রুশ গল্প একদিন বিশ্বজয় করবে' । তাঁর কথা যথার্থই ফলেছে।

এই সংকলনে যাঁদের গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁদের সবারই উত্থান উনিশ শতকে অর্থাৎ রুশ বিপ্লবের আগে। তাই ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব তাঁদের লেখায় সরাসরি প্রভাব না ফেললেও রুশ বিপ্লবের চেতনার সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগ তাঁদের ছিল। রুশ বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি এবং উৎপাদন উপকরণ ও সম্পর্কসমূহের সামাজিকীকরণ। রাশিয়ার সেই নিপীড়িত কৃষকজীবনের সুগভীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, শ্রমজীবী কৃষককুলের প্রতি প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ, সর্বোপরি তাদের দুঃখী জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে রূপান্তরিত করার ঐকান্তিক বাসনায় আর্ত হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকের লেখা। এছাড়া পরবর্তী রুশ সাহিত্যকে তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সার্বিক প্রেক্ষাপট।

রুশ সাহিত্যে প্রেম নিয়েও অনেক গল্প লেখা হয়েছে। মানুষের চেতনা ওলটপালট করে দেয়া চূড়ান্ত কামাবেগের কাহিনী এসব গল্পে অত্যন্ত শিল্পিতভাবে বুনে দেয়া আছে। এসব গল্প এতটাই মেদহীন ও মসৃণ যে মনে হয় সুদক্ষ হাতে ছেঁটে বসানো হয়েছে প্রতিটি শব্দ। তাই আজো বিশ্বপাঠক-মানসে অক্ষয় ছাপ রেখে চলেছে রুশ গল্পসম্ভার।

পৃথিবীখ্যাত উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাতজন রুশ সাহিত্যিকের সাতটি গল্প এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। সাতজন লেখক হলেন— ১. আলেক্সান্দর পুশকিন ২. নিকোলাই গোগল ৩. ইভান তুর্গেনেভ ৪. লেভ তলস্তয় ৫. মিখাইল সালতি কভশ্চেদ্রিন ৬. আন্তন চেখভ এবং ৭. ভ্লাদিমির করলেঙ্কো। তাঁদের গল্পগুলো হল যথাক্রমে ১. স্টেশনের ডাকবাবু ২. সরোচিনেৎসের মেলা ৩. দুই গায়ক ৪. বল-নাচের পর ৫. দুই হুজুর ও এক চাষার কাহিনী ৬. সাহিত্যের শিক্ষক এবং ৭. বন-গর্জন।

আলেক্সান্দর পুশকিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) গল্পে রাশিয়ার আত্মিক শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ আর টানাপড়েন তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে অনুসূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। 'স্টেশনের ডাকবাবু' গল্পে সমাজের বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের নিবিড় পর্যবেক্ষণ শিল্পিতভাবে ফুটে উঠেছে। এটি এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। অতিথিবৎসল, নিরীহ পোস্টমাস্টারের কন্যাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল অভিজাত সামরিক কর্মচারী। হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য বাবার সে-কী ব্যাকুলতা! সুগভীর দুঃখ আর অতিরিক্ত মদ্যপানে পোস্টমাস্টারের শেষপর্যন্ত যে মৃত্যু, তা নিবিড় সমবেদনার সাথে পুশকিন ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই গল্পে। সাধারণ মানুষের জন্য লেখকের অকৃত্রিম প্রেম গল্পটিতে রূপায়িত হয়েছে।

আলেক্সান্দর পুশকিনকে বলা যায়, রুশ সাহিত্যের জনক আর তাঁর রচনাকে বলা যায় রুশ জীবনের সত্যিকার বিশ্বকোষ। 'স্টেশনের ডাকবাবু' গল্পটি ১৮৩১ সালের দিকে রচিত যা তাঁর 'বেলকিনের গল্প' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

নিকোলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২) রাশিয়া তথা বিশ্বের একজন প্রতিভাধর ব্যঙ্গ-লেখক। ১৬শ ও ১৭শ শতক ধরে ইউক্রেনীয় জনগণের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম তা দ্বারা অন্যান্য সাহিত্যিকের মতো বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গোগলও। তিনি ছিলেন সচেতন দেশপ্রেমিক এবং ইউক্রেনীয় উপকথা ও লোকগাথার উৎসাহী পাঠক ও শ্রোতা। রাশিয়ার শৃঙ্খলিত মানুষের হাতে আলোর মশাল তুলে দেয়ার দায়িত্ব যেন গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কুপ্রথা ও ব্যর্থতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এসবের প্রতিমূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-লেখক হিসেবে। তাঁর দুঃসহ ব্যঙ্গ-আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন : 'He is an enemy of Russia and should be sent to Siberia in chains'.

'সরোচিনেৎসের মেলা' গল্পটিকে গোগল ঝলমলে করে তুলেছেন হাস্যরস আর অঢেল রোদের ছটায়। ইউক্রেনীয় স্তেপের অবারিত, মুক্ত, চপল আর উল্লাসী জনগণকে উদাস সুরে গান গেয়ে চলা তারুণ্যের প্রেম দিয়ে তুলির সুদক্ষ আঁচড়ে সতেজ করে মেলে ধরেছেন। সমগ্র রুশ সাহিত্যে বিচারমূলক বাস্তবতার সূত্রপাত করেছিলেন গোগল। তাই রুশ সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরকালীন। 'সরোচিনেৎসের মেলা' গল্পটি ১৮৩০ সালের দিকে রচিত। গল্পটি 'দিকানকার কাছে এক গ্রামের সন্ধ্যা' নামক কাব্যময় কাহিনীধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩) রাশিয়ার আরেক শ্রেষ্ঠ গল্পকার। ছোটগল্পের একজন সূক্ষ্ম রূপকার তিনি। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে 'দুই গায়ক' গল্পটি চিত্রিত করেছেন। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রাশিয়ার জনগণ। তাঁর বেশির ভাগ গল্পের কেন্দ্র— রাশিয়ার সাধারণ মানুষ যার স্পষ্ট ছাপ 'দুই গায়ক' গল্পেও তিনি রেখেছেন। গল্পটি ১৮৪৭ সালের দিকে লেখা।

গল্পকার হিসেবে লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) বিদ্রোহী এবং মহান। প্রতিভাবান এই শিল্পী বিশ্বসাহিত্যে বিচারমূলক বাস্তবতার আরেক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রাশিয়ার বুর্জোয়াযুগের ক্রান্তিকালীন গভীর উপলব্ধি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। অভিজাত মহলের বীভৎস চেহারার বিপরীতে তিনি স্থাপন করেছেন সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ মাখা তরঙ্গিত জীবন। দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে জাতীয় উত্থান-পতনের মধ্যে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছেন। অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন কালের গতি কোন্ দিকে ঘুরছে, রথের রশি মূলতই কাদের হাতে। তলস্তয়ের সৃষ্টি তাই তাঁকেও তুলে ধরে বিশ্বইতিহাসের এক শীর্ষ সম্মানীয় আসনে।

মিখাইল সালতি কভশ্চেদ্রিন (১৮২৬-১৮৮৯) বিশ্বসাহিত্যের আরেক মহান ব্যঙ্গ-লেখক। তিনি উনিশ শতকের ৬০-এর দশকের একজন বিপ্লবী প্রতিনিধি। 'দুই হুজুর ও এক চাষার কাহিনী' গল্পটি ৮০-র দশকে রচিত হয়েছিল। গল্পটি সারা পৃথিবীতেই পরিচিতি পেয়েছে এবং পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যে আন্তন চেখভ একটি বিশেষ নামে পরিচিত : তা হল 'The master' এবং এ নাম যেন একমাত্র তাঁকেই মানায়। তিনি হচ্ছেন এমন শিল্পী যাঁর হাতের ছোঁয়ায় একটুকরো পাথর ভাস্কর্য হয়ে ওঠে, ছেঁড়া রঙিন কাগজ ফুলের রূপ পায়। একটুখানি তার থেকে সেতারের ঝঙ্কার ওঠে। চেখভ সে বিশ্বাসেই বলেছিলেন: 'Everything in nature has a meaning'। তিনি প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, যেমন জলস্রোতের প্রতিটি তরঙ্গ সমুদ্রের সন্ধান বয়ে আনে।

আজীবন রুগ্ণ চেখভ ছাত্রজীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন কৌতুকগল্পের মধ্যদিয়ে। তাঁর লেখায় তরল কৌতুকের হাত ধরে মানবহৃদয়ের গভীরে বেজে ওঠে মহাজীবনের সমুদ্রধ্বনি। লেখায় তিনি অসাধারণ কিন্তু নির্মম। তাঁর নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গি মায়ায়, করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। চেখভ ঘৃণা করতেন অত্যাচার, মিথ্যাচার, শক্তিমানের আত্মতুষ্টি আর দুর্বলের হীনতাকে। লেখার মাধ্যমে তিনি আঘাত করেছেন নীচতাকে। অধিক মূল্য দিয়েছেন সত্য, মানুষের মর্যাদা এবং নৈতিক সৌন্দর্যকে। গোর্কির ভাষায় : 'আন্তন চেখভ রাশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ সুহৃদ, বুদ্ধিমান এক সত্যসন্ধ বন্ধু।' নিঃসন্দেহে চেখভের গল্প অভিনব শিল্প-পথিকৃৎ এবং রসবোধে বলা যায় অদ্বিতীয়। জনৈক আলোচকের ভাষায় : 'চেখভের গল্প পড়লে মনে হয়, এ যেন শেষ হেমন্তের একটি বিষণ্ন দিন, যখন বাতাস থাকে স্বচ্ছ, পাতাঝরা গাছগুলো আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে দৃশ্যমান হয়, বাড়িগুলো সব একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকে আর মানুষগুলো হয় নিষ্প্রভ ও বিষণ্ন। সবকিছুই এত বিস্ময়কর, নিশ্চল, শক্তিহীন। দূর দিগন্ত নীলাভ হতে হতে ম্লান আকাশের সঙ্গে মিশে যায়, একটা ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা বাতাস আধজমা কাদার ওপর নিশ্বাস ফেলে।' চেখভের 'সাহিত্যের শিক্ষক' গল্পটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। উনিশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে রাশিয়ার অবক্ষয়শীল সামন্ততন্ত্র, বুদ্ধিজীবী মনের সংশয়, আশাবাদ, কৃষকশ্রেণির প্রতি নির্মম শোষণের বিপক্ষে চূড়ান্ত নৈপুণ্য আর তীক্ষ্ণতায় চেখভের শান্তিকামী মানসের প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এতে গল্পে অপরূপ একটি মেয়ের প্রেম পেয়েছেন এর নায়ক, হয়ে উঠেছেন পরিবারের কর্তা, মান্যগণ্য ভদ্রলোক এবং তারপর হঠাৎ একদিন ব্যক্তিগত সুখের কাছ থেকে পালালেন তিনি। 'সাহিত্যের শিক্ষক' গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৪ সালের দিকে। গল্পটি চেখভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ভ্লাদিমির করলেঙ্কো (১৮৫৩-১৯২১) বিখ্যাত ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব যুগের মেজাজ নানাভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। 'বন-গর্জন' গল্পটি ১৮৮৬ সালের দিকে লেখা। অন্যান্য রুশ-সাহিত্যিকের মতো তিনিও রাশিয়ার রাজনীতি ও সমাজের নানা জটিলতা তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সামাজিক জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন, যা পৃথিবীর মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ়তম ভালোবাসার স্বাক্ষরবাহী।

শওকত হোসেন

সূচি

স্টেশনের ডাকবাবু ॥ আলেক্সান্দর পুশকিন ১৩
সরোচিনেৎসের মেলা ॥ নিকোলাই গোগল ২৭
দুই গায়ক ॥ ইভান তুর্গেনেভ ৫৫
বল-নাচের পর ॥ লেভ তলস্তয় ৭৫
দুই হুজুর ও এক চাষার কাহিনী ॥ মিখাইল সালতি কভশ্চেদ্রিন ৮৭
সাহিত্যের শিক্ষক ॥ আন্তন চেখভ ৯৭
বন-গর্জন ॥ ভ্লাদিমির করলেঙ্কো ১২৩

মূল রুশগল্প থেকে অনুবাদ : **ননী ভৌমিক**
'বল–নাচের পর' গল্পের অনুবাদ : **সমর সেন**

পুশকিন আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ (১৭৯৯—১৮৩৭) — রুশ সাহিত্যের জনক, প্রতিভাধর কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর রচনা হল রুশ জীবনের সত্যকার বিশ্বকোষ। 'স্টেশনের ডাকবাবু' (১৮৩১) আছে তাঁর গল্পধারা 'বেলকিনের গল্প' বইটিতে।

আলেক্সান্দর পুশকিন
স্টেশনের ডাকবাবু

পদে অবিশ্যি কেরানিবাবু,
ডাক-স্টেশনেতে স্বৈরপ্রভু।

প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কি

এমন কে আছে যে স্টেশনের ডাকবাবুকে অভিশাপ দেয়নি, গালাগালি দেয়নি? রূঢ়তা, বেয়াদবি ও বেআক্কেলেপনার নিষ্ফল নালিশ টুকে রাখার জন্য হঠাৎ খেপে উঠে সেই করাল খাতাখানা চেয়ে বসেনি; সেকেলে নায়েবদের মতো, এবং অন্ততপক্ষে মুরোম্‌ দস্যুদের মতোই মানবজাতির কুলাঙ্গার বলে তাকে ভাবে না কে? তবু একবার নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করা যাক এবং ওদের জায়গায় দেখা যাক নিজেকে দাঁড় করিয়ে। তাহলে হয়তো-বা অনেক ক্ষমার চোখে ওদের দেখা সম্ভব হবে।

ডাকবাবুটি কে? নিতান্তই সর্বনিম্ন কর্মচারী পদের এক শহীদ। চড়চাপড় ঘুষি থেকে যে বাঁচে শুধু তার সরকারি তকমাটির জোরে, তা-ও সর্বদা নয় (পাঠকেরা নিজের বিবেকের দিকে তাকান)। প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কি যাকে রহস্য করে 'ডাকস্টেশনের স্বৈরপ্রভু' বলে অভিহিত করেছেন সেই লোকটির কাজটা কী রকম? একেবারে খাঁটি কয়েদ খাটুনি নয় কি? দিনে-রাতে শান্তি নেই। বিরক্তিকর যাত্রাপথে যত রাগ জমে ওঠে, তার সবই এসে যাত্রীরা ঝাড়ে ডাকবাবুর ওপর। আবহাওয়াটা বিশ্রী, রাস্তা জঘন্য, কোচোয়ানটা একগুঁয়ে, ঘোড়াগুলো গেঁতো— এর সব দোষ ডাকবাবুর। তারই হতভাগ্য ঘরখানায় এসে উঠে যাত্রীরা তাকেই গণ্য করছে শত্রু বলে। অনিমন্ত্রিত এই অতিথিদের কবল থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পেলে সে তার সৌভাগ্য। আর যদি ঘটনাচক্রে সে সময় ঘোড়া মজুত না থাকে? ... হায় ভগবান, তাহলে সে কী গালাগালি তর্জনগর্জনের পালা! বৃষ্টি হোক কাদা হোক এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি করে বেড়াতে সে বাধ্য। ক্ষিপ্ত যাত্রীর চিৎকার আর

ঘাড়ধাক্কা থেকে ক্ষণেকের মুক্তির জন্য তাকে হয়তো বড়দিনের তুষারপাত আর ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাইরের খোলা বারান্দায়। হয়তো এলেন এক জেনারেল, কম্পমান ডাকবাবুকে তার শেষ দুটো ত্রয়কাও ছেড়ে দিতে হল— অথচ এর একটা ছিল ডাকগাড়ির জন্য রিজার্ভ করা। মৌখিক একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে জেনারেল চলে গেলেন। আর তার পাঁচ মিনিট পরেই শোনা গেল ঘণ্টার শব্দ— সরকারি হরকরা এসে টেবিলের উপর হুকুমনামা ফেলে দিয়ে তাজা ঘোড়ার চাহিদা জানিয়ে বসল!... এই ঘটনাগুলো ভালো করে ভেবে দেখলে ক্রোধের বদলে হৃদয় ভরে উঠবে অকৃত্রিম সহানুভূতিতে।

তাছাড়া আরো কয়েকটা কথা বলি। কুড়ি বছর ধরে আমি রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রায় সবকটি ডাকরাস্তা আমার চেনা। কোচোয়ানদের কয়েক পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি চিনি না কিংবা সংস্রবে আসিনি এমন ডাকবাবু নেই বললেই হয়। আমার এইসব সফরের সময় যেসব চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা যথাসত্বর প্রকাশ করার একটা আশাও আমার আছে। আপাতত এইটুকু বলি যে স্টেশনের ডাকবাবু এই সম্প্রদায়টা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ধারণা সেটা খুবই ভুল। বহুনিন্দিত এই ডাকবাবুরা আসলে বেশ শান্তিপ্রিয় লোক, পরোপকারী স্বভাব, বেশ মিশুক ব্যবহার, নিজেদের মানমর্যাদা নিয়ে খুঁতখুঁতি নেই, আর টাকার খাঁইও খুব বেশি নয়। বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক বহু বিষয় তাদের কথাবার্তা থেকে আহরণ করা সম্ভব (পরিব্রাজক মহাশয়েরা অযথাই এগুলো তাচ্ছিল্য করেন)। আমার কথা যদি বলেন, আমি বরং সরকারি কাজে ভ্রাম্যমাণ কোনো ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির রাজপুরুষের ভাষণ শোনার চাইতে এদের সঙ্গেই আলাপ করতে ভালোবাসি।

বুঝতেই পারছেন, ডাকবাবু এই শ্রদ্ধেয় সম্প্রদায়টির মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছে। বলতে কী, এদের একজনের স্মৃতি আমার কাছে অতি মূল্যবান। ঘটনাচক্রে আমায় তার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। তারই কথা আমি এবার আমার দরদী পাঠকদের কাছে বলব।

১৮১৬ সালের মে মাসে আমাকে ক...গুবের্নিয়া দিয়ে যেতে হয়েছিল, সে পথটা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি তখন খুদে এক অফিসারের পদে ঢুকেছি, যেতে হয়েছিল ডাকরাস্তা দিয়েই, কিন্তু পয়সা ছিল কেবল দুটি ঘোড়ার জন্য। ফলে ডাকবাবুরা আমায় বিশেষ সম্ভ্রম দেখাত না। তাই আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য বলে আমার ধারণা, তা আমাকে প্রায়ই আদায় করতে হত জোরজার করে। বয়স তখন কাঁচা, স্বভাবটাও ছিল একটু রগচটা। তাই যখন আমার ত্রয়কার জন্য তৈরি রাখা ঘোড়া হঠাৎ কোনো এক বড় চাকুরিয়াকে দিয়ে দেওয়া হত তখন এইসব ডাকবাবুদের নীচতা ও কাপুরুষতা আমাকে খেপিয়ে তুলত। এটা গা-সহা করতে আমার ততদিনই লেগেছিল, যতদিন লেগেছিল লাটসায়েবের

ভোজসভায় বিচক্ষণ ভৃত্যের খাদ্য পরিবেশনে আমার বাদ পড়াটা গা-সহা করে নিতে। আজকাল ও-দুটো ব্যাপারই আমার কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কেননা পদমর্যাদার হিসেবে যারা ছোট তারা বড়কে মানবে এই নিয়মের বদলে যদি ধরা যাক মননশক্তির হিসেবে যারা ছোট তারা তাদের চেয়ে বড়দের মানবে এই নিয়ম চালু করা যায় তাহলে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াবে? কী ভয়ানক তর্কই-না শুরু হয়ে যাবে! চাকরবাকরেরাই-বা কাকে পরিবেশনের সময়ে তোয়াজ করবে প্রথম? কিন্তু সে কথা যাক, কাহিনীতে ফিরে আসি।

সেদিন বেশ গরম পড়েছিল। ক ... ডাক-স্টেশনটায় পৌঁছতে তখনো তিন ভার্স্ট পথ বাকি, এমন সময় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজে চবচবে হয়ে গেলাম। ডাক-স্টেশনটায় পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পোশাক বদলে ফেলা এবং দ্বিতীয় কাজ চায়ের হুকুম করা। ডাকবাবু হাঁক দিল, 'এই দুনিয়া, সামোভারটায় আগুন দে তো, আর গিয়ে খানিকটা ক্রিম জোগাড় করে আন্।' জবাবে পার্টিশান দেয়ালের ওপাশ থেকে বছর-চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ছুটে গেল বাইরের বারান্দার দিকে। মেয়েটির রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'ও কে, তোমার মেয়ে?' বেশ অহঙ্কারের সুরে ডাকবাবু বলল, 'হ্যাঁ, ভারি বুদ্ধিমতী, ভারি চটপটে— ঠিক ওর পরলোকগত মায়ের মতো।'

লোকটা আমার অর্ডার টুকে নিতে শুরু করল, আর আমি তার অনাড়ম্বর কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় দেয়ালে-টাঙানো ছবিগুলো দেখতে শুরু করলাম। ছবিগুলোতে 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে একজন শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধকে। মাথায় তার রাতের টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। একটি অস্থিরমতি যুবককে তিনি বিদায় দিচ্ছেন। যুবকটি তাড়াহুড়া করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ আর একটি টাকার থলি গ্রহণ করছে। পরের ছবিতে খুব জাজ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুবকটির স্খলিত চরিত্রের কথা। পানভোজনের টেবিলের সামনে সে বসে আছে আর তার চারিপাশে ঘিরে আছে কপট বন্ধু ও লজ্জাহীনা নারীর দল। এর পরে রয়েছে যুবকটির সর্বনাশ ঘটার ছবি— পরনে ছেঁড়া-ছেঁড়া পোশাক, মাথায় তেকোনা টুপি, শুয়োর চরাচ্ছে আর ওই শুয়োরের খাদ্যই ভাগ করে খাচ্ছে। মুখে তার গভীর বিষাদ ও অনুশোচনার ছাপ। শেষ ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে সে বাপের কাছে ফিরে এসেছে, সহৃদয় বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় এবারেও সেই রাতের টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। তিনি ছুটে এসেছেন তাকে গ্রহণ করতে। কুপুত্র তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে— পেছনে দেখা যাচ্ছে বাবুর্চি একটি মোটাসোটা গোবৎস জবাই করছে আর যুবকটির বড়ভাই চাকরবাকরদের জিগ্যেস করছে : ধুমধামের কারণটা কী? প্রত্যেকটি ছবির নিচেই জুতসই সব জার্মান ছড়াও বেশ পাঠ করা গেল। এ সবটাই এখনো আমার স্পষ্ট

মনে আছে— মনে আছে সেই ফুলভর্তি ভাঁড়টা, রঙচঙে পর্দা ঢাকা বিছানাটা, আমার চারপাশে যতকিছু জিনিস ছিল সব। গৃহকর্তাটির মূর্তি এখনো আমার চোখে ভাসছে— স্বাস্থ্যবান, ফুর্তিবাজ, বছর পঞ্চাশেক বয়স, গায়ে একটা লম্বা সবুজ জোব্বা, তাতে বিবর্ণ ফিতেয় লটকানো তিনটি মেডেল।

আমার আগের কোচোয়ানকে পাওনা মিটিয়ে দিতে-না-দিতেই দুনিয়া ফিরে এল তার সামোভার নিয়ে। কিশোরী এই লাস্যময়ীর বুঝতে দেরি হয়নি, আমার মনে সে কীরকম ছাপ ফেলেছে। আমাকে দেখে সে তার বড় বড় নীল চোখদুটো নামিয়ে নিল। তার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলাম আমি— সে একটুও সঙ্কোচ না করে জবাব দিয়ে গেল সংসারাভিজ্ঞা মেয়ের মতো। দুনিয়ার বাপের দিকে আমি একগ্লাস মদের পাঞ্চ এগিয়ে দিলাম— দুনিয়ার জন্য এগিয়ে দিলাম এককাপ চা। তারপর তিনজনে কথা কইতে শুরু করলাম যেন কত কাল থেকে আমাদের জানাশোনা।

অনেক আগেই ঘোড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাকবাবু আর তার মেয়েটিকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। তবু একসময় উঠতে হল। বাপ শুভযাত্রা কামনা করল, মেয়ে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে এল। বার-বারান্দায় এসে আমি একটু দাঁড়ালাম, চুমু খাওয়ার অনুমতি চাইলাম। দুনিয়া আপত্তি করল না।

'যেদিন থেকে নেমেছি এই পথে ...' সেদিন থেকে অনেক চুম্বনই আমি পেয়েছি। কিন্তু তার কোনোটার স্মৃতিই এমন দীর্ঘ, এমন মধুর হয়ে থাকেনি।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ঘটনাচক্রে আবার আমাকে সেই একই পথ দিয়ে সেই একই সব জায়গায় যেতে হয়েছিল। বুড়ো ডাকবাবুর মেয়েটির কথা আমার মনে ছিল। তাকে আবার দেখা যাবে এই কল্পনায় খুশি হয়ে উঠেছিল মনটা। কিন্তু মনে হল, হয়তো বুড়ো ডাকবাবুর জায়গায় এখন অন্য কেউ এসেছে, ইতিমধ্যে দুনিয়ার বিয়েও হয়ে গেছে নিশ্চয়। ওদের কেউ একজন হয়তো-বা বেঁচেই নেই— এ কথাটাও আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল আর ডাক-স্টেশনের দিকে যত এগুতে লাগলাম ততই নানা আশঙ্কায় মন হয়ে উঠছিল বিষণ্ন।

ঘোড়াগুলো এসে ডাকবাড়িটার সামনে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর ঢুকতেই নজরে পড়ল সেই 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা ছবিগুলো। টেবিল আর বিছানাটা সেই পুরনো জায়গাটিতেই আছে। কিন্তু জানালায় এবার আর কোনো ফুল দেখা গেল না। ঘরের সবকিছুতেই কেমন একটা জীর্ণতা আর অবহেলার ছাপ। ডাকবাবু একটি ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমার আগমনে ঘুম ভেঙে উঠে বসল ... হ্যাঁ, সিমিওন ভিরিনই বটে, কিন্তু কী ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে লোকটা! ও যখন আমার অর্ডার নকল করে নিচ্ছিল তখন ওর পাকা চুল, না কামানো গালের উপর গভীর ভাঁজ, আর কুঁজো হয়ে আসা পিঠের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক না

হয়ে পারলাম না, অমন হৃষ্টপুষ্ট একটা মানুষ এই তিন-চার বছরেই এমন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে গেল কী করে! 'আমায় চিনতে পারছ না?' আমি বললাম, 'আমরা পুরনো আলাপী।' ও বিমর্ষভাবে বলল, 'তা খুবই সম্ভব। রাস্তাটা বড়, অনেক যাত্রীই এখানে আসে।' বললাম, 'তা তোমার দুনিয়া ভালো আছে তো?' বুড়োমানুষটা ভ্রুকুটি করল, বলল, 'ভগবান জানেন।' 'ওর বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে?' বুড়োলোকটা ভাব দেখাল যেন আমার কথা সে শুনতে পায়নি। বিড়বিড় করে আমার অর্ডারখানা পড়ে যেতে লাগল। সুতরাং প্রশ্ন করা বন্ধ রেখে কেটলিটা চাপাতে হুকুম দেওয়া গেল। কৌতূহল আমায় খোঁচা মারছিল। আশা করলাম একগ্লাস পাঞ্চ দিয়ে আমার পুরনো বন্ধুর মুখ খোলা যাবে।

আশাটা ভুল হয়নি। এগিয়ে দেওয়া গ্লাসটাতে বুড়োর আপত্তি হল না। দেখা গেল 'রাম' টানতে টানতে ওর বিমর্ষ ভাবটা কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গ্লাসের শেষে সে কথা কইতে শুরু করলে। আমি কে তা চিনতে পারলে, অন্তত চিনতে পারার ভান করল। অতঃপর তার কাছে থেকে যে কাহিনীটা শোনা গেল, তা যুগপৎ আমায় ভয়ানক রকমের আকৃষ্ট ও বিচলিত করে তুলেছিল।

ও শুরু করল, 'তাহলে আমার দুনিয়াকে আপনি চিনতেন? কেই-বা তাকে না চিনত! দুনিয়া! দুনিয়া রে! কী মেয়েই না সে ছিল! এখানে যেই এসেছে সেই ওর তারিফ করেছে। কেউ নিন্দে করেনি। জমিদারগিন্নিরা ওকে কত উপহারই না দিয়েছে, কেউ একটা রুমাল কেউ একজোড়া দুল। জমিদারবাবুরা এলে খাবারদাবারের অজুহাতে ইচ্ছে করেই দেরি করত, আসলে ওকে আরো কিছুক্ষণ দেখতে চাইত। যতই রাগ হোক না কেন, ওকে দেখামাত্র রাগ জল হয়ে যেত— আমার সঙ্গে তারা কথা শুরু করত ভদ্রভাবে। বিশ্বাস করবেন না হয়তো— কিন্তু হরকরা আর সরকারি পিয়নরা পর্যন্ত আধঘণ্টাখানেক কথা কয়ে যেত ওর সঙ্গে। ওর দৌলতেই সংসার চলত। এটা পরিষ্কার করা, ওটা রান্না করা, সবই পরিপাটি। আর আমি এই বুড়ো বেকুব— দেখে আমার আর আশ মিটত না, আনন্দ আমার আর ধরত না। দুনিয়াকে ভালোবাসিনি তা তো নয়, ওকে মাথায় করে রাখতে চাইনি তা তো নয়। জীবনে ওর দুঃখ-কষ্ট তো কিছু ছিল না! কিন্তু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে কি আর কেউ সর্বনাশ ঠেকাতে পেরেছে?— কপাল খণ্ডাবে কে!' এই বলে ডাকবাবু সর্বনাশের বিশদ বিবরণ আমায় শোনাল :

তিন বছর আগে এক শীতের সন্ধ্যায় ডাকবাবু নতুন একটা খাতার উপর রুল টানছে আর তার মেয়ে পার্টিশানের পেছনে বসে বসে নিজের জন্য একটা পোশাক সেলাই করছে। এমন সময় একটি ত্রয়কা এসে থামল। একজন যাত্রী ঘরে ঢুকল। মাথায় তার একটা চের্কেসীয় টুপি, গায়ে একটা মিলিটারি গ্রেটকোট আর মোটা মাফলার। ঢুকেই সে ঘোড়ার তলব করল। ঘোড়া তখন সব বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তা শুনে যাত্রীটি তার গলার পর্দা চড়াল, উঁচু করল হাতের চাবুক। এরকম ঘটনা দেখতে দুনিয়া অভ্যস্ত ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পার্টিশানের পেছন থেকে ছুটে এসে সে মোলায়েমভাবে জিগ্যেস করল উনি কিছু খাবেন কিনা। দুনিয়ার উদয়ে সচরাচর যা ঘটে এবারেও তাই ঘটল। যাত্রীটির রাগ পড়ে গেল। ঘোড়া না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজি হয়ে রাতের খাবারের ফরমাশ দিল। ভেজা খসখসে ফারের টুপিটা খুলল, মাফলারটা খসাল আর গ্রেটকোটটা ছুড়ে ফেলল। দেখা গেল লোকটা ছিমছাম চেহারার একজন তরুণ ঘোড়সওয়ার অফিসার। মুখে তার ছোট কালো একটু মোচ। ডাকবাবুর সংসারে সে বেশ জমে বসল, ডাকবাবু আর তার মেয়ের সঙ্গে খোশগল্প শুরু করে দিল। রাতের খাবার দেওয়া হল। ইতিমধ্যে ঘোড়াও এসে গিয়েছিল। ডাকবাবু হুকুম দিল ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেবারও দরকার নেই। এখুনি তাদের ওই যাত্রীটির স্লেজের সঙ্গে যুতে দিতে হবে। ঘরে ফিরে কিন্তু দেখা গেল যুবকটি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে। লোকটার নাকি অসুস্থ বোধ হচ্ছে, মাথা ধরেছে, সফর করার মতো অবস্থা নয় ... কী আর করা যায়? ডাকবাবু তার নিজের বিছানাটি ওর জন্য ছেড়ে দিল। ঠিক হল রোগী যদি সকালের মধ্যে ভালো হয়ে না ওঠে তাহলে ... শহর থেকে বৈদ্য ডেকে আনতে হবে।

পরের দিন ঘোড়সওয়ারটির অবস্থা আরো কাহিল হয়ে দাঁড়াল। ওর চাকর গেল ঘোড়া চেপে কাছের শহরটায় বৈদ্য ডেকে আনতে। ভিনিগারে রুমাল ভিজিয়ে দুনিয়া তার কপালে জলপটি দিয়ে বিছানার পাশে গিয়ে বসল সেলাই নিয়ে। ডাকবাবু সামনে থাকলে রোগী শুধু উহ্ আহ্ করত, একটা কথাও প্রায় বলতে পারত না, যদিও কাপ দুয়েক কফি সে খেল ঠিকই আর গোঙাতে গোঙাতেই ফরমাশ দিল ডিনারের। দুনিয়া তার পাশ থেকে কখনো নড়ত না। মিনিটে মিনিটে লোকটার তেষ্টা পেত আর দুনিয়া তার জন্য নিজের হাতে তৈরি করা এক এক মগ লেমনেড এনে দিত। রোগী তা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মগ ফেরত দেবার সময় প্রত্যেকবারই দুনিয়ার হাতটা নিজের দুর্বল মুঠিতে ধরে চাপ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা বোঝাত। বৈদ্য এলেন ডিনারের সময়। তিনি রোগীর নাড়ি দেখলেন, রোগীর সঙ্গে কথা কইলেন জার্মান ভাষায়, তারপর রুশ ভাষায় জানালেন যে এখন রোগীর প্রয়োজন শুধু বিশ্রামের। দিন দুয়েকের মধ্যেই সে সফর করার মতো অবস্থায় ফিরে আসবে। ঘোড়সওয়ারটি তাঁকে ভিজিট বাবদ পঁচিশ রুবল শোধ দিয়ে ডিনারে নেমন্তন্ন করল। বৈদ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন না। তারপর দুজনে মিলে খেল পেট পুরে, এক বোতল মদ নিঃশেষ করল আর বিদায় নিল অতি বন্ধুর মতো।

আরো একদিন কাটল। ঘোড়সওয়ারটি পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠল। ভারি খুশি দেখা গেল তাকে, অনবরত রহস্য তামাশা করল কখনো দুনিয়ার সঙ্গে,

কখনো ডাকবাবুর সঙ্গে, শিস দিয়ে গান গাইল, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গল্প জমাল, লেজারে যাত্রীদের অর্ডার সব নিজেই টুকে রাখল, লোকটাকে শেষপর্যন্ত ভালোমানুষ ডাকবাবুর এতই পছন্দ হয়ে গেল যে তৃতীয় দিন সকালে এই অমায়িক অতিথিটিকে বিদায় দিতে কষ্ট হল তার। দিনটা ছিল রবিবার— দুনিয়া গির্জায় যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। ঘোড়সওয়ারটির স্লেজটিকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। তার থাকা-খাওয়ার বাবদ লোকটা ডাকবাবুকে ঢালাওভাবে বকশিশ করে বিদায় নিল। দুনিয়ার কাছেও সে বিদায় নিল, প্রস্তাব করল যাবার পথে দুনিয়াকে সে গির্জায় পৌঁছে দিয়ে যাবে, কারণ গির্জাটা ছিল গাঁয়ের শেষপ্রান্তে। মনে হল দুনিয়া একটু বিব্রতবোধ করছে। কিন্তু বাপ বলল, 'ভয় কী, হুজুর তো আর নেকড়ে নন। খেয়ে ফেলবেন না; তা গাড়ি করেই যা না গির্জায়।' দুনিয়া স্লেজে উঠে লোকটার ঠিক পাশেই বসল। চাকরটি লাফিয়ে উঠল বক্স সিটে। কোচোয়ান শিস দিল, ঘোড়া ছুটল কদমে।

বেচারি ডাকবাবু কখনো ভেবে পায়নি কী করে সে তার দুনিয়াকে ও লোকটার সঙ্গে যেতে দিল, কী করে অমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, কী করে অমন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল তার। আধঘণ্টাও কাটেনি, ডাকবাবুর বুকটা টনটন করতে শুরু করল। এমনই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল তাকে যে সে আর থাকতে পারল না, দুনিয়ার খোঁজ করতে গেল গির্জায়। গির্জার কাছে পৌঁছতে দেখা গেল লোকজন সব বেরিয়ে আসছে কিন্তু গির্জার দাওয়ায় বা আঙিনায় কোথাও দুনিয়ার দেখা পাওয়া গেল না। গির্জার ভেতরেও সে ঢুকল হন্তদন্ত হয়ে। পুরোহিত বেদি ছেড়ে চলে গেছে। সেক্সটন মোমবাতিগুলো নিবিয়ে দিতে শুরু করেছে, শুধু এককোণে দুটি বুড়ির তখনও প্রার্থনা শেষ হয়নি। কিন্তু দুনিয়া নেই কোথাও। অভাগা বাপ শেষপর্যন্ত সেক্সটনকেই জিগ্যেস করল, দুনিয়া প্রার্থনায় এসেছিল কিনা। সেক্সটন জানাল সে আসেনি।

ডাকবাবু যখন বাড়ি ফিরল তখন তাকে জ্যান্ত মানুষ বলে আর চেনা যায় না। তার শেষ আশা তখনো এই— দুনিয়া হয়তো তার এক কৈশোরের লঘুচিত্ততায় পরের ডাকঘাঁটি পর্যন্ত উজিয়ে গিয়ে থাকবে, সেখানে তার ধর্ম-মা আছেন। যে গাড়িখানা দেওয়া হয়েছিল সেটা ফিরে না আসা পর্যন্ত ডাকবাবুকে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করতে হল। সারাদিন কেটে গেল, কোচোয়ান ফিরল না। অবশেষে রাতের দিকে সে ফিরল একা এবং একটু মত্ত অবস্থায়। যে সংবাদ সে দিল তা মারাত্মক। পরের ডাকঘাঁটি থেকে দুনিয়া লোকটার সঙ্গেই কোথায় চলে গিয়েছে।

বুড়োমানুষটা এই দুর্বিপাক সইতে পারল না। সেই রাতেই সে বিছানা নিল— সেই বিছানা যাতে ঠিক আগের দিন তরুণ প্রতারকটি শুয়েছিল। সব ব্যাপারটা মনে মনে খতিয়ে দেখে ডাকবাবুর এখন মনে হল অসুখের ঘটনাটা

ছিল ভান। বেচারির জ্বর বাড়তে লাগল হুহু করে, তাই তাকে স... শহরে নিয়ে যাওয়া হল। অন্য একজন ডাকবাবু তার জায়গায় বহাল হল সাময়িকভাবে। যে বৈদ্যটি সেই ঘোড়ওয়ারটিকে দেখেছিলেন তিনিই ডাকবাবুরও চিকিৎসা করলেন। তাঁর কাছ থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে লোকটা নাকি বেশ সুস্থই ছিল, তখনই নাকি বৈদ্যটি তার বদ মতলব টের পেয়েছিলেন কিন্তু ঘোড়সওয়ারটির চাবুকের ভয়ে কাউকে কিছু বলেননি। জার্মানটা সত্যিকথাই বলুক কিংবা নিতান্তই তার দূরদৃষ্টির বড়াই করেই থাকুক, তাতে বেচারা রোগীর কোনো সান্ত্বনাই ছিল না। অসুখ সারামাত্রই সে স... শহরের ডাক কর্তৃপক্ষের কাছে দুমাসের ছুটির দরখাস্ত করল এবং কাউকে কিছু না বলে মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল পায়ে হেঁটে। লেজার থেকে সে দেখে নিয়েছিল ক্যাপটেন মিন্‌স্কির গন্তব্য ছিল স্মলেন্‌স্ক থেকে পিটার্সবুর্গ। যে কোচোয়ান তাদের গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল সে বলল দুনিয়া নাকি সারা রাস্তা কেঁদেছে, যদিও দেখে মনে হচ্ছিল সে নিজের ইচ্ছেতেই গিয়েছে। ভাবল, 'আমার হারিয়ে যাওয়া মেষশাবকটিকে হয়তো ফিরিয়েই আনব।' এই আশায় ডাকবাবু এসে পৌছল পিটার্সবুর্গে। সেখানে সে উঠল ইজমাইলভ রেজিমেন্টে, অবসরপ্রাপ্ত এক ননকমিশনড অফিসারের ঘরে। সামরিক সার্ভিসের সময় এ লোকটি ছিল তারই এক সহযোদ্ধা। সেখান থেকে সে তার সন্ধান শুরু করল। শিগগিরই খোঁজ পাওয়া গেল যে ক্যাপটেন মিন্‌স্কি পিটার্সবুর্গেই আছে— দেমুতভ পান্থনিবাসে নাকি তার আস্তানা। ডাকবাবু ঠিক করল তার ওখানে গিয়ে হাজির হবে।

অতি প্রত্যুষে সে মিন্‌স্কির সদর-ঘরে এসে সেপাই চাকরকে অনুরোধ করল— হুজুরকে যেন সে খবর দিয়ে বলে যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। একটা সওয়ারি-বুট খোঁটায় লাগিয়ে চাকরটা সেটাকে পরিষ্কার করছিল। সে বলল, 'কর্তা ঘুমুচ্ছেন, এগারোটার আগে তিনি কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন না।' ডাকবাবু তখন চলে গেলেও ফিরে এল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন, মাথায় একটা লাল ফেজ— মিন্‌স্কি নিজেই এসে তার সঙ্গে দেখা করলে। বলল, 'কী চাই ভাই তোমার?' বুড়োর বুকের ভেতরটা তখন টগবগ করছে, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধু বললে, 'হুজুর, ভগবানের দোহাই, হুজুর দয়া করুন!...' মিন্‌স্কি তার দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে লাল হয়ে উঠল। তারপর তাকে হাতে ধরে নিজের আপিসঘরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। বুড়ো বলে চলল, 'হুজুর, কথায় বলে একবারের পতন, চিরকালের মতন। তবু অন্তত আমার বেচারি দুনিয়াকে ফিরিয়ে দিন। তাকে নিয়ে আপনার যা আনন্দ করার তা তো করেছেন— মিছিমিছি তাকে আর মারবেন না।' যুবাপুরুষটি ভয়ানক থতমত খেয়ে বলল, 'যা ঘটেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। তোমার

প্রতি আমি অবিচার করেছি, আমায় ক্ষমা করো। তবে ভেবো না যে দুনিয়াকে ফেলে পালাব। ও সুখী হবে— তোমায় শপথ করে বলছি। তাকে নিয়ে তুমি কী করবে? আমায় সে ভালোবাসে। তার আগের জীবনের সঙ্গে সে আর খাপ খাবে না। যা ঘটে গেছে তা ভুলতে তুমিও পারবে না, সে-ও পারবে না।' তারপর ডাকবাবুর আস্তিনের মধ্যে কী একটা গুঁজে দিয়ে সে দরজা খুলে দিল। ডাকবাবু ঠাহরও করতে পারল না কখন সে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বহুক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষপর্যন্ত খেয়াল হল আস্তিনের মধ্যে কী একগোছা কাগজ রয়েছে। জিনিসটা বার করতে দেখা গেল পঞ্চাশ রুবলের কয়েকটা দলামোচড়া নোট। চোখ ছাপিয়ে আবার তার কান্না এল— ক্রোধের কান্না। নোটগুলো একটা দলা পাকিয়ে সে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল, তারপর জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে গেল সে ... কয়েক পা যাবার পর দাঁড়িয়ে পড়ে আবার কী ভাবল, তারপর ... ফিরে এল ... কিন্তু নোটগুলো তখন আর সেখানে নেই। বেশ সাজগোজ করা একটি যুবক ওকে দেখে ছুটে গেল একটা ছ্যাকরা গাড়ির দিকে এবং চটপট বসে হুকুম দিল, 'চালাও!' তাকে অনুসরণ করার কোনো চেষ্টাই ডাকবাবু আর করল না। ঠিক করল ডাক-স্টেশনেই ফিরে যাবে। কিন্তু তার আগে মাত্র একবারের জন্য হলেও অভাগা দুনিয়াকে একবার দেখে যেতে হবে। সেই উদ্দেশে দিনদুই পরে সে আবার গেল মিন্‌স্কির কোয়ার্টারে। কিন্তু সেপাই চাকরটা কড়া গলায় জানিয়ে দিল তার মনিব কারো সঙ্গেই দেখা করবে না। তারপর ঘাড়ে ধরে তাকে হলের বাইরে ঠেলে দিয়ে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর ফিরে গেল ডাকবাবু।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে দীন গির্জায় সাধারণ প্রার্থনার পর লিতেইনায়া স্ট্রিট ধরে ফিরছিল। এমন সময় একটা দামি গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাকবাবুর নজরে পড়ল তাতে মিন্‌স্কি বসে আছে। গাড়িটা তিনতলা একটা বাড়ির সামনে দরজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল আর মিন্‌স্কি লাফ দিয়ে নামল বাড়িটার বার-বারান্দায়। একটা আশা ঝলক দিয়ে গেল ডাকবাবুর মনে। ফিরে এসে সে কোচোয়ানকে জিগ্যেস করল, 'কার গাড়ি ভাই এটা? মিন্‌স্কির নয় কি?' কোচোয়ান বলল,'তারই বটে, কেন?' 'ব্যাপার হয়েছে কী, তোমার মনিব আমায় বলেছিলেন তাঁর দুনিয়ার কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে। কিন্তু এই দুনিয়া কোথায় থাকে, সেই ঠিকানাটা ভুলে গেছি।'— 'সে কী? সে তো এখানেই থাকে, ওই দোতলায়। কিন্তু চিঠি পৌঁছাতে ভাই তোমার বড় দেরি হয়ে গেছে। মিন্‌স্কি নিজেই এসে হাজির হয়ে গিয়েছেন যে।' ডাকবাবুর বুকের মধ্যে দুর্বোধ একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'দরকার আর নেই। পাত্তা মিলিয়ে দিলে সেজন্য ধন্যবাদ। তবে আমার যা কাজ, তা করি।' এই বলে সে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

দরজা বন্ধ ছিল। ঘণ্টা দিয়ে সে ডাকল। প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় কয়েক সেকেন্ড তার কাটল। অবশেষে দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া গেল, দরজা খুলল। সে জিগ্যেস করল, 'আভদোতিয়া সিমিয়োনোভনা কি থাকেন এখানে?' অল্পবয়সী ঝি-টি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, থাকেন, কী দরকার?' কোনো কথার জবাব না দিয়ে ডাকবাবু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে হলের ভেতরে। ঝি পেছন থেকে হাঁক দিল, 'না, না, ভেতরে যাওয়া চলবে না! আভদোতিয়া সিমিয়োনোভনার কাছে এখন অতিথি।' কিন্তু ডাকবাবু কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়েই গেল। প্রথম যে দুটি ঘর পড়ল তা অন্ধকার। কিন্তু তৃতীয় ঘরখানায় আলো জ্বলছে। খোলা দরজাটার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। অতি সুসজ্জিত ঘরখানার ভেতরে মিন্‌স্কি গভীর কী একটা চিন্তায় মগ্ন। দুনিয়া তার চেয়ারের হাতলে বসে আছে ঠিক ইংরেজি কায়দায় ট্যারচাভাবে ঘোড়ায় চাপার ভঙ্গিতে। সাজসজ্জায় তার ফ্যাশনের বেশ ঘটা। মিন্‌স্কির দিকে সে চেয়ে আছে স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে আর তার কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ নিয়ে জড়াচ্ছে তার জড়োয়া আঙুলে। বেচারি ডাকবাবু! মেয়েকে তার এত রূপসী সে আর কখনো দেখেনি। মুগ্ধের মতো সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। 'কে ওখানে?' মুখ না তুলেই জিগ্যেস করল দুনিয়া। ডাকবাবু চুপ করে রইল। জবাব না-পেয়ে দুনিয়া মুখ তুলে তাকাল ... আর তারপর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের উপর। ভয় পেয়ে মিন্‌স্কি দুনিয়াকে ধরে তোলার জন্য যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখল দরজায় বুড়ো ডাকবাবু দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়াকে ফেলে রেখে সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল তার দিকে। দাঁতে দাঁতে চেপে জিগ্যেস করল, 'কী চাও তুমি? ডাকাতের মতো আমার পিছু নিয়েছ কেন বলো তো? নাকি খুনটুন করার ইচ্ছে? বেরোও এক্ষুনি!' তারপর সজোরে বুড়োর কোটের কলার ধরে টানতে টানতে সে তাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলে।

বুড়োমানুষটা তার ডেরায় ফিরে এল। বন্ধুটি পরামর্শ দিল নালিশ করতে। ডাকবাবু কী ভাবল খানিক, তারপর হাত নেড়ে ঠিক করল কিছুই সে করবে না। দুদিন পরে পিটার্সবুর্গ ছেড়ে সে ফিরে এল তার ডাক-স্টেশনে। এসে বসল তার সেই পুরনো কাজেই।

গল্প শেষ করে ডাকবাবু বলল, 'সেদিন থেকে আজ প্রায় তিন বছর— দুনিয়া আমার কাছ-ছাড়া। খবর নেই, সংবাদ নেই। ভগবান জানেন, মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি নেই। কী না ঘটতে পারে। পথচলতি লম্পট মেয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে দিনকয়েক রেখে ভাগিয়ে দিল এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল তা তো নয়, এই শেষও নয়। পিটার্সবুর্গে এরকমের কাঁচা বয়সের বেকুফ মেয়ে কত! আজ হয়তো তারা সাটিন আর মখমলে সাজগোজ করছে। কাল দেখবেন চৌমাথার

মোড়ে ঝাড়ু দিচ্ছে সর্বস্বান্ত কাঙাল ভিখিরিদের সঙ্গে। যখন মাঝে মাঝে মনে হয় কে জানে আমার দুনিয়াও হয়তো ওই অবস্থায় গিয়ে পড়বে, তখন ইচ্ছে না থাকলেও পাপচিন্তাই মনে আসে, ভাবি কবরেই যাক মেয়েটা...'

এই হল আমার বন্ধু বুড়ো ডাকবাবুর কাহিনী— সে কাহিনী বলতে গিয়ে বারবার তাকে থামতে হয়েছে চোখের জলে, দ্‌মিত্রিয়েভের সেই অপরূপ ব্যালাডের জেদি তেরেন্তিচের মতো সে চোখের জল সে কোটের প্রান্ত দিয়ে বারবার যেভাবে মুছে নিচ্ছিল তা দেখবার মতো। এই চোখের জলের আংশিক একটা কারণ অবশ্যই আমার দেওয়া সেই পাঞ্চ— কাহিনী বলতে বলতে সে পাঁচ গ্লাস টেনেছিল। কিন্তু সে যাই হোক, তার কান্না আমার খুবই মর্মস্পর্শ করে। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর অনেকদিন পর্যন্ত বুড়ো ডাকবাবুর কথা আমি ভুলতে পারিনি, অনেক দিন ধরেই মনে হয়েছে হতভাগিনী দুনিয়ার কথা ...

কিছুদিন আগে ক ... শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই পুরনো বন্ধুর কথা আবার মনে পড়েছিল। খবর পেলাম যে ডাক-স্টেশনটায় সে একচ্ছত্র ছিল সেটা আর নেই। 'বুড়ো ডাকবাবু কি এখনো বেঁচে আছে?' এ প্রশ্নের কেউ সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারল না। ইচ্ছে হল একবার আগের সেইসব পরিচিত জায়গাগুলো দেখে আসি। ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ন ... গাঁয়ের দিকে গাড়ি হাঁকালাম।

তখন শরৎকাল। ধূসর রঙের মেঘে আকাশ ছাওয়া— ফসলকাটা ক্ষেত থেকে হিমেল বাতাস বইছে, লাল হলুদ ঝরাপাতা উড়িয়ে আনছে সঙ্গে করে। সূর্য ডোবার ঠিক আগেই গাঁ-খানায় এসে পৌঁছলাম এবং ডাকঘরের সামনে থামলাম। মোটামতো একটা মাগী এসে দাঁড়াল বার-বারান্দায় (একদিন এখানেই আমায় চুমু খেয়েছিল হতভাগিনী দুনিয়া)। আমার প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি জানাল যে বুড়ো ডাকবাবু বছরখানেক আগে মারা গেছে, তার বাড়িতে এখন থাকে একজন শুঁড়ি, মেয়েটি আসলে সেই শুঁড়িরই বউ। আমার এতখানি আসা আর তার জন্য সাত রুবল খরচাই সার হল দেখে আফসোস হচ্ছিল। শুঁড়ি-বউকে জিগ্যেস করলাম, 'মারা গেল, কী হয়েছিল?' মেয়েটা বললে, 'মদ খেয়েই গেছেন বাবু।'— 'কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে?'— 'গাঁয়ের ঠিক শেষে— ওর বউয়ের কবরের পাশে।'— 'আমায় কেউ তার কবরে একবার নিয়ে যেতে পারে?'— 'তা কেন পারবে না। এই ভান্‌কা! বেড়াল নিয়ে খুব হয়েছে, এবার এই ভদ্দরলোকটিকে একটু কবরখানায় নিয়ে যা। গিয়ে ডাকবাবুর কবরটা দেখিয়ে দিবি।'

ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা, বাদামি চুল, এক চোখ কানা একটা ছেলে ছুটে এসেই চটপট পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁয়ের শেষপ্রান্তে।

যেতে যেতে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি ডাকবাবুকে চিনতে?'

'চিনব না কেন! ওই তো আমায় বাঁশি বানাতে শিখিয়েছিল। যেই সে শুঁড়িখানা থেকে বেরুত— ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন— অমনি আমরা তার পেছনে ছুটতাম, "দাদু, ও দাদু, বাদামদাদু!" আমাদের সকলকে সে বাদাম বিলাত। আমাদের সঙ্গে ভারি ভাব ছিল তার।'

'আচ্ছা, যাত্রীরা তার খোঁজখবর করে এখনো?'

'আজকাল যাত্রী তো আর বিশেষ আসে না। হাকিম-টাকিম মাঝেমধ্যে আসে, কিন্তু মরা লোকদের নিয়ে তাদের কোনো গরজ নেই। তবে এই বছর গরমকালে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি বুড়ো ডাকবাবুর কথা জিগ্যেস করছিলেন, তার কবর দেখতেও এসেছিলেন।'

কৌতূহল হল। জিগ্যেস করলাম, 'কীরকম মহিলা?'

ছেলেটা বলল, 'ভারি সুন্দর দেখতে। ছয় ঘোড়ার এক গাড়িতে করে উনি এসেছিলেন। সঙ্গে তিনটে বাচ্চা, একজন আয়া, আর একটা কালো বাঁটকুল কুকুর। যেই শুনল বুড়ো ডাকবাবু মরে গেছে, অমনি কী তার কান্না, ছেলেমেয়েদের বললেন, 'তোরা চুপ করে একটু বসে থাক্, আমি কবরখানায় যাব।' পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ডাক পড়েছিল আমার। কিন্তু উনি বললেন, "পথ আমি চিনি।" ভারি দরাজ মেয়ে— আমায় পাঁচ কোপেকের চাঁদি সিক্কা দিয়েছিলেন একটা।'

কবরখানায় পৌঁছানো গেল। ন্যাড়া একটা জায়গা— কোথাও এতটুকু বেড়া নেই। এখানে ওখানে কাঠের ক্রস— গাছের কোনো চাঁদোয়াও নেই তাদের উপর। এমন বিষণ্ন একটা কবরখানা আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

ছেলেটা একটা বালির ঢিপির উপর লাফিয়ে উঠে বলল, 'এই হল বুড়ো ডাকবাবুর কবর।'

ঢিবিটার উপর পেতলের মূর্তি লটকানো কালো একটি ক্রস পুঁতে রাখা হয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, এইখানেই এসেছিলেন মহিলাটি?'

ভানিয়া বলল, 'হ্যাঁ, এসেছিলেন। আমি দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এসে লুটিয়ে পড়লেন এখানে, পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর মহিলাটি গাঁয়ে ফিরে এসে পাদরিকে ডেকে পাঠান, টাকাপয়সা দেন তাকে আর আমাকে দেন পাঁচ কোপেকের একটা চাঁদি সিক্কা— ভারি দিলদরিয়া মহিলা!'

আমিও ছোঁড়াটাকে একটা পাঁচ কোপেকি সিক্কা দিলাম। এখানে আসা বা তার জন্য যে সাত রুবল খরচা হল— তাতে আমার আর কোনো আফসোস ছিল না।

গোগল নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ (১৮০৯-১৮৫২) — মহান ব্যঙ্গলেখক, রুশ সাহিত্যে বিচারমূলক বাস্তবতার সূত্রপাত করেন।
'সরোচিনেৎসের মেলা' (১৮৩০) গল্পটি 'দিকানকার কাছে এক গ্রামের সন্ধ্যা' নামক উচ্ছল কাব্যময় কাহিনীধারার একটি।

নিকোলাই গোগল
সরোচিনেৎসের মেলা

১

ঘরে আর মন টেকে না।
নিয়ে যা ঘরের বার, ঘরের বার,
যেথাকে গোলমালে একাকার,
যেথাকে কুমারীরা নেচে চলে,
যেথাকে মাতন লাগায় ছেলের দলে!

প্রাচীন কিংবদন্তি থেকে

মালোরুশিয়ায় গ্রীষ্মের দিনগুলো কী মদির, কী উচ্ছল! কী তাপশ্রান্ত সেই সময়টা যখন নৈঃশব্দ্যে ও উত্তাপে জ্বলজ্বল করে মধ্যদিন আর অপার নীল গগন একটা কামনামধুর গম্বুজের মতো উপুড় হয়ে থাকে পৃথিবীর উপর, মনে হয় যেন নিজের শূন্যের আলিঙ্গনে সুন্দরীকে সজোরে পাশবদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে বিভোর হয়ে! সে আকাশে মেঘ নেই। মাঠে শব্দ নেই। সব যেন মরে গেছে; শুধু উপরে আকাশের গহিনে ঝঙ্কার তোলে ভরতপাখি, আর শূন্যের সিঁড়ি বেয়ে প্রেমাতুর মাটিতে নেমে আসে তার রুপোলি গান, আর থেকে থেকে স্তেপভূমিতে শোনা যায় গাংচিলের ডাক নয়তো বনমুরগির কাংস্যকণ্ঠ। প্রকাণ্ড ওকগাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অলস নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে, যেন উদ্দেশ্যহীন একটা আড্ডা জমিয়েছে তারা, আর রোদের চোখধাঁধানো আঘাতে ঝলসে ওঠে পুরো একসার চিত্রার্পিত পল্লবগুচ্ছ, সেইসঙ্গে অন্য আর এক সারের উপর নিক্ষিপ্ত হয় রাত্রির মতো কালো ছায়া— শুধু জোর বাতাস বইলেই যে ছায়ায় সোনা ফুটে ওঠে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুলগুলো মাথা বাড়িয়ে থাকে রঙচঙা সবজিক্ষেতগুলোর ওপর, আর বাতাসে ভেসে বেড়ায় নানা পতঙ্গের চুনীপান্না। বিচালির ধূসর স্তূপ আর শস্যের

সোনালি গাদা ছাউনির মতো ছড়িয়ে থাকে মাঠে, ডেরা বাঁধে তার অসীমতায়। চেরি, প্লাম, আপেল, নাশপাতির ফলভারানত প্রসারিত শাখা; আকাশ— তার নির্মল মুকুর, গর্বোন্নত শ্যাম তটের মধ্যে নদী— কী মদালস তৃপ্তিতে ভরা এই মালোরুশিয়ার গ্রীষ্ম!

এমনি উচ্ছলতায় জ্বলজ্বল করেছিল আগস্টের এক তপ্ত দিন, সালটা হবে আঠারো শ... আঠারো শ ... মানে তারো বছর তিরিশ আগে, যেদিন সরোচিনেৎস গ্রাম পর্যন্ত দশ ভের্স্ট রাস্তাটা সবই হয়ে উঠেছিল লোকে লোকারণ্য, দূরের কাছের সমস্ত খামার থেকে লোক যাচ্ছিল মেলায়। সকাল থেকেই নুন আর মাছ নিয়ে গাড়ির যে সারি শুরু হয়েছিল তার আর শেষ ছিল না। খড়বিচালির মধ্যে বসানো হাঁড়িকলসির পাহাড় চলছিল ধীরে ধীরে, বোধ হচ্ছিল যেন তারা তাদের বন্দিদশা ও অন্ধকারে ব্যাজার; শুধু কোথাও কোথাও উঁচু করে বাঁধাছাঁদা বেড়ার উপর থেকে সগর্বে উঁকি দিচ্ছিল রঙচঙে কোনো সরা বা ভাঁড় এবং সমঝদারদের সকাম দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। অনেক পথচারীই ঈর্ষাভরে তাকাচ্ছিল এই ধনসম্পত্তির মালিক লম্বাপানা কুম্ভকারটির দিকে। ধীর পদক্ষেপে সে যাচ্ছিল তার পশরার পেছন পেছন, তার এই মৃন্ময় গরবী গরবিণীদের সে ফের সযত্নে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল ওই অসহ্য বিচালির গাদায়।

রাস্তার একপাশ দিয়ে ক্লান্ত বলদে টানা বস্তা, শণ, শাদা কাপড় আর নানারকম সাংসারিক জিনিসে ভরা একটা গাড়ি যাচ্ছিল আলাদাভাবে, পেছন পেছন তার মালিক, গায়ে পরিষ্কার একটা কামিজ কিন্তু পরনের পাজামাটায় ময়লা লাগা। তার গাঢ় রঙের মুখের উপর যে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছিল, এমনকি তার লম্বা মোচ বেয়ে গড়িয়েও পড়ছিল, সেই ঘামটা সে মুছে নিচ্ছিল অলস হাতে, সে মুখে তার এমন এক প্রসাধন যা দিয়ে এক নির্দয় প্রসাধনকর বিনা আহ্বানেই সুন্দরী-কুৎসিত সকলের কাছেই জোর করে এসে হাজির হয়ে আজ হাজার কয়েক বছর ধরে মানবজাতির সবাইকেই প্রসাধিত করে আসছে। তার পাশে পাশেই চলেছে গাড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা মাদি ঘোড়া, তার শান্তশিষ্ট হাবভাব দেখেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। বহু পথচারীই, বিশেষ করে জোয়ান ছেলেরা আমাদের এই চাষিটির কাছাকাছি এসে সম্মান দেখাচ্ছিল টুপি খুলে। কিন্তু এটা তারা যে করছিল সেটা লোকটির শ্বেত গুম্ফ ও ভারিক্কি চালচলনের জন্য নয়; দৃষ্টিটা একটু উপরে তুললেই সম্মান প্রদর্শনের কারণ বোঝা যায়। গাড়ির মালপত্তরের উপর বসেছিল সুন্দরী একটি মেয়ে, গোলগাল মুখ, কালো দুটি ভুরু তার উজ্জ্বল বাদামি চোখের উপর নিটোল হয়ে বেঁকে আছে ধনুকের মতো; গোলাপি ঠোঁটদুটিতে নিশ্চিন্ত হাসি, লম্বা বেণিগুচ্ছে লাল নীল ফিতে বাঁধা, ফুল গোঁজা, মোহন মাথাটির উপর তা এক মুকুট রচনা করে তুলেছে। সবকিছুতেই যেন মেয়েটির আগ্রহ, সবই তার কাছে অপরূপ, অভিনব ... সুন্দর

চোখদুটি তার একটা থেকে আরেকটা বস্তুতে নিরবকাশে ধাবিত। মুগ্ধ না হয়ে উপায় কী! মেলায় যে তার এই প্রথম! আঠারো বছরের মেয়ে মেলায় এল এই প্রথম!... তবে রাস্তার লোকদের কেউ জানত না বাপের সঙ্গে আসতে তাকে কত সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে। বাপ হয়তো তাকে আগেই নিয়ে আসত, কিন্তু পারেনি তার হিংসুটে সৎমায়ের জন্য— বাপকে সে তেমনি অনায়াসেই চালায় যেমন বাপ এতদিন চালিয়ে এসেছে ওই বুড়ি মাদী ঘোড়াটাকে, দীর্ঘ সেবার প্রতিদানে আজ যেটিকে টেনে আনা হচ্ছে বিক্রি করে দেবার জন্য। খাণ্ডারণী বউ বটে ... কিন্তু বলতে মনে ছিল না, মালপত্তরের চুড়োয় সে-ও এখানেই বসে আছে, গায়ে তার একটা সবুজ পশমের বাহারে ব্লাউজ, তাতে এর্মিন ফারের মতো কিছু পুচ্ছ সেলাই করা, তবে রঙটা শুধু লাল, পরনে দামি রঙচঙে ঘাগরা, দাবার ছকের মতো চৌখুপি কাটা, মাথায় ফুল-কাটা সূতি টুপি, তাতে কেমন একটা বিশেষ রকমের ভারিক্কি ভাব ফুটে উঠেছে তার লালচে ভরাট মুখে, সে মুখে এমন একটা অপ্রীতিকর হিংস্রতা যে সকলেই তৎক্ষণাৎ তাদের সশঙ্ক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছিল মেয়েটির হাসিখুশি মুখে।

নিপারের উপনদী প্সিয়োল দেখা গেছে ততক্ষণে, দূর থেকে ভেসে আসছিল ঠাণ্ডা আমেজ, উত্ত্যক্ত, বিকট গরমের পর সেটা বেশ জানান দিচ্ছিল। মাঠের এলোমেলো ছড়ানো পপলার আর বার্চগাছের গাঢ় কৃষ্ণ ও ফিকে সবুজ পল্লবের মধ্যদিয়ে দেখা যাচ্ছিল শিখাময় শীতল ঝলক, নদী-সুন্দরী অনাবৃত করে দিচ্ছিল তার ঝকঝকে রুপোলি বুক, যার উপর ঝাঁকড়া হয়ে নুয়ে পড়েছে সবুজ গাছগাছালি। মদির এই মুহূর্তগুলোতে যখন তার অবিকল মুকুরে অমন নিখুঁত করে ধরা পড়ে তার গরবে দ্যুতিতে ভরা কপাল, তার লিলি-ধবল স্কন্ধ, তার পিঙ্গল মাথা থেকে তরঙ্গে নেমে আসা গাঢ় চুলের পটে আঁকা মর্মর গ্রীবা, যখন অবজ্ঞায় এক-একটা অলঙ্কার ছুড়ে ফেলে সে তুলে নেয় অন্য আর একটা আভরণ, শখের আর শেষ মেলে না— তখন এই খেয়ালিনী প্রায় প্রতি বছরেই তার পরিবেশটিকে বদলে নেয়, ধেয়ে যায় নতুন পথে, নতুন নতুন বিচিত্র দৃশ্যপটের হাট বসায়। সারি সারি মিল তাদের ভারি ভারি চাকায় ঢালাও তরঙ্গ তোলে, সজোরে নিক্ষেপ করে ফেনা ওঠায়, জলবিন্দু ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারিপাশটা শব্দে ঢেকে দেয়।

আমাদের পরিচিত যাত্রীদের নিয়ে গাড়িটা এই সময় সেতুর উপর গিয়ে উঠেছে, আর সমস্ত রূপ, সমস্ত মহিমায় নদীটা তাদের সামনে পড়ে আছে একটা অখণ্ড কাচের মতো। আকাশ, নীল সবুজ বন, হাঁড়িকলসির গাড়ি, মিলগুলো— সবই দেখা যাচ্ছে উল্টো করে, উপর দিকে পা করে দাঁড়িয়ে আছে বা চলছে, তলিয়ে যাচ্ছে না তার গভীর অপরূপ অতলে। দৃশ্যের সমারোহ দেখে আমাদের সুন্দরীটি অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সমস্ত পথটা সে যে সূর্যমুখীর বিচি খেতে খেতে এসেছিল, সেটাও থেমে গেল তার, হঠাৎ কানে এল : 'সত্যি,

মেয়ে বটে!' তাকিয়ে দেখল সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে ছেলেদের একটা ভিড়, তার মধ্যে একটি ছেলে কোমরে হাত রেখে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল বাহাদুরির চালে; সাজপোশাকটা তার অন্যদের চেয়ে ঘটা বেশি, গায়ে সাদা রঙের আধা-চাপকান, মাথায় একটা ছেয়ে-রঙের রেশেতিলভকি টুপি। ছেলেটার রোদপোড়া কিন্তু মিষ্টিমুখটা নজর না করে সুন্দরী পারল না, আর তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো মনে হল যেন তার ভেতরটা ভেদ করে দেখছে; কথাটা সম্ভবত এ-ই বলেছে ভেবে চোখ নামিয়ে নিল সে।

'অপরূপ মেয়ে', চোখ না সরিয়েই সাদা চাপকান পরা ছেলেটি বলে গেল, 'ওকে একবার চুমু খেতে পারলে আমি আমার সবকিছু দিয়ে দিতে রাজি। আর দ্যাখ দ্যাখ, একটা পেতনি বসে আছে রে সামনে!'

হো হো হাসি উঠল চারিদিক থেকে; কিন্তু ধীরগমন স্বামীটির অতিভূষিতা সহধর্মিণীর কাছে এরূপ সম্বোধন প্রীতিকর হল না; তার লালচে গাল আগুনে হয়ে উঠল, ফুর্তিবাজ ছোকরাটির উদ্দেশে বাছাই করা বর্ষণ ছাড়ল সে :

'গলায় গেরাস ঠেকে মর তুই হতভাগা মুটে! তোর বাপের মাথায় কলসি ভাঙুক! বরফে পা হড়কাক তোর বাপ, খ্রিস্টের শত্তুর! নরকে তার দাড়ি পোড়াক ভূতেরা!'

'দ্যাখ দিকি, গাল দিচ্ছে কেমন!' এরূপ অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণের প্রবল উৎসারে যেন বা থমকে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে থেকে ছোকরাটি বলল, 'একশ বছুরে ডাইনি, এসব কথা বলতে বুড়ির জিভও টাটায় না।'

'একশ বছুরে!' কথাটা লুফে নিল আমাদের বর্ষীয়সী সুন্দরী, 'মুখপোড়া কোথাকার, যা মুখ ধুগে যা! অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার! তোর মাকে জানি না বটে, তবে এই বলে দিলাম, ওঁছা মাল তোর মা, ওঁছা মাল তোর বাপ, ওঁছা মাল তোর চাচি-মাসি! সাতপুরুষের ওঁছা মাল! বলে কিনা একশ বছুরে! নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোয় ...'

এই সময় গাড়িটা সেতু থেকে নেমে যেতে শুরু করায় শেষ কথাগুলো শোনা গেল না; কিন্তু ছেলেটা মনে হল ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হতে দিতে চাইল না। বেশি কিছু না ভেবেই সে ছুড়ে মারল একদলা কাদা নিয়ে। নিক্ষেপটা আশাতীত রকমের সফল হল; গিন্নির নতুন টুপিটা একেবারে কাদামাখা হয়ে গেল, আড্ডাবাজদের অট্টহাস্য উঠল আরো জোরে। শৌখিন নধরাঙ্গিনীটি রাগে ফুঁসল; কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে, ঝাল ঝাড়ল তার নির্দোষ সৎমেয়ে আর গজেন্দ্রগমন স্বামীটির ওপর; লোকটা অবশ্য এরূপ ঘটনায় বহুদিন অভ্যস্ত থাকায় অটুট মৌনাবলম্বন করে রইল এবং ক্রুদ্ধা স্ত্রীর চামুণ্ডা ভাষণ শুনে গেল নির্বিকার মুখে। তা সত্ত্বেও কিন্তু রমণীর অক্লান্ত জিহ্বা বকবক করেই চলল, যতক্ষণ না তারা এসে পৌঁছল শহরের উপকণ্ঠে তাদের পুরনো স্যাঙাত কসাক ৎসিবুলিয়ার বাড়ির কাছাকাছি। বহুদিন না দেখা স্যাঙাত-সইদের দেখাসাক্ষাতে এই অপ্রীতিকর

ঘটনাটার কথা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের যাত্রীদের মাথা থেকে অপসৃত হল, আলাপ শুরু হল মেলা নিয়ে, দীর্ঘপথের পর তারা বিশ্রাম নিল খানিকটা।

২

বাপরে! মেলায় কী নেই বলো! চাকা, কাচ, আলকাতরা, তামাক, চামড়া, পেঁয়াজ, কত রকমের দোকান ... থলিতে যদি তোমার রুবল তিরিশেকও থাকে, তাহলেও গোটা মেলাটা কিন্তু কেনা যাবে না।

মালোরুশীয় কমেডি থেকে*

সম্ভবত কোথাও আপনারা পড়ন্ত জলপ্রপাতের শব্দ শুনে থাকবেন, যখন ভীত-শঙ্কিত চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কলরোলে এবং অদ্ভুত অস্পষ্ট সব ধ্বনি ও গর্জনের একটা তাণ্ডব বাহিত হয়ে আসে। গ্রাম্য মেলায় যখন সমস্ত দেহটা নড়েচড়ে ওঠে, যখন সমস্ত লোকেই চেঁচায়, হাসে, ডাক ছাড়ে; তখনকার কলরোলেও কি ঠিক সেই একই অনুভূতি হয় না আপনাদের? গোলমাল, গালাগালি, হাম্বা হাম্বা, ব্যাব্যা, হাঁকডাক— সবই মিলেমিশে যায় একটা বিকট আলাপে। বলদ, বস্তা, বিচালি, বেদের দল, হাঁড়িকলসি, মেয়ে মাগী, পিঠে, টুপি— সবই জ্বলজ্বলে রঙচঙে, বেসুরো, গুচ্ছে গুচ্ছে আবর্তিত হচ্ছে চোখের সামনে। নানান কণ্ঠের কথায় ডুবে যায় সব কণ্ঠই, একটা শব্দকেও ধরা যায় না, বাঁচানো যায় না এই মহাবন্যা থেকে, একটি আওয়াজও পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। শোনা যায় কেবল মেলার চারদিক থেকে কিনিয়ে-বেচিয়েদের হাতে তালি মেরে দরাদরির নিষ্পত্তি। মাল বোঝাই গাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ, লোহার ঝনঝন, মাটিতে ছুড়ে ফেলা কাঠ-তক্তার ধুপধাপ— মাথা গোলমাল হয়ে যায়, বোঝা যায় না কোন্‌দিকে ফিরব।

আমাদের কৃষ্ণ-ভ্রু মেয়েটিকে নিয়ে যে চাষিটি এসেছিল, অনেক আগে থেকেই সে লোকজনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে চলেছে। কখনো এসে দাঁড়ায় একটা গাড়ির কাছে, আর একটার কাছে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, দরাদরি করে। আর মনটা তার ফেরে কেবলি দশ বস্তা গম আর মাদী ঘোড়াটাকে নিয়ে, যা সে নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্যে। তার মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যায়, গম আর ময়দার গাড়ির কাছে ঘুরঘুর করাটা তার কাছে খুব প্রীতিকর ঠেকছিল না; তার ইচ্ছে হচ্ছিল সেইদিকে যায় যেখানে শামিয়ানার ছাউনির নিচে ফলাও করে ঝোলানো আছে লাল ফিতে, কানের দুল, টিনের আর তামার ক্রস, আর গলায় পরার চাকতি। তবে দেখবার মতো

* গোগলের কমেডি 'সাদাসিধে লোক' থেকে।

অনেক জিনিস এখানেও সে পেল, খুবই মজা লাগল তার এই দেখে যে একজন বেদে আর একজন চাষি দরাদরির নিষ্পত্তি করে এমন জোর হাতে-হাত দিল যে ব্যথায় প্রায় ককিয়ে উঠল তারা, মাতাল এক ইহুদি ল্যাং মারল একটা মাগীকে; ঝগড়াটে দুই দোকানি মেয়ে পরস্পরের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে, এক রুশি এক হাতে তার ছাগলে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে, আর অন্য হাতে ... হঠাৎ সে টের পেল কে যেন তার জামার নকশি হাতা ধরে টানল। তাকিয়ে দেখে সেই জ্বলজ্বলে চোখ, সাদা চাপকান পরা ছেলেটি। চমকে উঠল সে, এমন বুক ঢিপঢিপ করে উঠল যা কোনো সুখে কোনো দুঃখে কখনো হয়নি; ভারি আশ্চর্য আর অপরূপ বোধ হল তার, ভেবে পেল না নিজেকে নিয়ে কী করবে।

'ভয় নেই লক্ষ্মীটি, ভয় নেই!' তার হাত ধরে মৃদুস্বরে সে বলল, 'খারাপ কিছু বলব না!'

'হয়তো সত্যিই তুমি খারাপ কথা কিছু বলবে না', মনে মনে ভাবল মেয়েটি, 'কিন্তু কী আশ্চর্য ... নিশ্চয় শয়তানের কাজ! মনে মনে তো জানাই আছে যে ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেবার জোর পাচ্ছি না যে।'

চাষিটা তাকিয়ে দেখল, মেয়েকে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কানে এল একটা কথা : 'গম'। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হল কথাটায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে যোগ দিল সরবে আলাপরত দুই ব্যাপারির সঙ্গে, কোনোকিছুর দিকে মন দেবার আর ফুরসুত হল না। ব্যাপারিরা গম নিয়ে যে আলাপ করছিল, সেটা এই :

৩

দেখেছ তো, লোকটা কেমন?
খুব বেশি নেই এ সংসারে।
ভোদকা টানে জলের মতোন!
*কথলিয়ারেভস্কি, 'এনেইদা'**

'তুমি তাহলে বলছ ভায়া, আমাদের গমের গতিক খারাপ?'

যে লোকটা বলছিল তার চেহারাটা সফরে বেরুনো শহরবাসীর মতো, পরনে রঙচঙে মোটা সূতিকাপড়ের ঢোলা ট্রাউজার, তাতে আলকাতরা আর চর্বির দাগ। যাকে বলছিল তার পরনে জায়গায় জায়গায় তালি মারা একটা নীল আধা-চাপকান, কপালে একটা ফোলা।

'সে আর বলতে : এক মাপ গমও যদি বিক্রি হয় তবে গলায় দড়ি বেঁধে আমায় সসেজ ঝোলানো করে এই গাছটায় ঝুলিয়ে দিয়ো।'

---

* কথলিয়ারেভস্কি—ইউক্রেনের কবি, গোগলের সমসাময়িক, প্রাচীন কবি ভার্জিলের বিখ্যাত কবিতা 'এনেইদা'র প্যারডি।

'কী যে বলছ, ভায়া! আমরা ছাড়া গম তো আর কেউ আনেনি।' ঢোলা ট্রাউজার পরা লোকটি আপত্তি করল।

আমাদের সুন্দরীর বাপটি দুই ব্যাপারির এ আলাপে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি, মনে মনে সে ভাবল : 'হুঁ হুঁ, যা মন চায় বলে যাও। আমার কাছে কিন্তু দশ বস্তা মজুদ।'

'কথাটা হল এই : ভূতুড়ে কাণ্ড যদি কোথাও লাগে তাহলে ভালো কিছুর আশা বৃথা, তোমার ওই নিরন্ন মস্কালদের* কাছ থেকে যেমন ভালো কিচ্ছু কখনো মেলে না।' কপাল ফোলা লোকটা বলল খুব অর্থময় একটা ভাব করে।

'কিসের ভুতুড়ে কাণ্ড?' ঢোলা ট্রাউজার পরা লোকটা জিগ্যেস করল।

'লোকে কী বলাবলি করছে শোনোনি?' বিষণ্ন চোখের একটা তির্যক দৃষ্টিপাত করে বলল কপাল-ফুলো।

'কী বলছে!'

'ওই কী কী নিয়েই থাক! আমাদের ছোট হাকিম, ভগবান করুন, জমিদারবাড়িতে মদ টেনে মুখ মোছারও যেন কপাল না হয় লোকটার, এই ছোট হাকিম মেলার জায়গা বরাদ্দ করেছে একটা ভুতুড়ে এলাকায়, এখানে মরে গেলেও গম বিকোবে না। ওই পুরনো ভেঙে পড়া চালাটা দেখছ তো, টিলার নিচে দাঁড়িয়ে আছে?' (এই সময় আমাদের সুন্দরীটির কৌতূহলী পিতা আরো কাছে সরে এসে একেবারে মনোযোগের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াল)। 'ওই চালাটাতেই চলে সব ভুতুড়ে কাণ্ড। এ জায়গাটায় কোনো মেলাই ভালোয় ভালোয় পেরোয়নি। কাল আমাদের ভোলোস্তের সেরেস্তাদার রাত করে যাচ্ছিল, হঠাৎ কিনা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শুয়োরের মুখ, এমন ঘোঁৎঘোঁৎ করল যে সেরেস্তাদারের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আরো দেখো আবার লাল কোর্তা ফের না আসে।'

'লাল কোর্তা আবার কী?'

শুনেই আমাদের মনোযোগী শ্রোতাটির লোম খাড়া হয়ে উঠল। সভয়ে পেছনদিকে তাকাতেই দেখে তার মেয়েটি শান্তভাবে ছেলেটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, মধুর কী এক কাহিনী শোনাচ্ছে পরস্পরকে, ভুলে গেছে দুনিয়ার সবকিছু কোর্তার কথাই। এতে তার ভয় দূর হয়ে আগের নিশ্চিন্ত ভাবটা ফিরে এল।

'বাহবা, বাহবা ভায়া! জড়িয়ে ধরার কায়দা আছে দেখছি! আর আমি আমার আগের বউ খ্‌ভেসকাকে জড়িয়ে ধরতে শিখি কেবল বিয়ের চারদিন পরে। তা-ও আমার স্যাঙাতের দৌলতে, সেই বুঝিয়ে শুনিয়ে দেয়।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল তার প্রেয়সীর বাপটি বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নয়, মনে মনে ভাবতে লাগল কী করে তাকে পক্ষে টানা যায়।

---

* ইউক্রেনবাসীরা তাচ্ছিল্য করে রুশিদের এই নামে ডাকত।

'তুমি বাপু লোক ভালো বটে, তবে আমায় চিনতে পারলে না, আমি তোমায় দেখেই চিনেছিলাম।'

'তা চিনতে পারো।'

'যদি চাও তো দ্যাখো তোমার নামধাম সবকিছু বলে দিচ্ছি : নাম তোমার সলোপি চেরেভিক।'

'তাই বটে গো, সলোপি চেরেভিক।'

'আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখো তো, চিনতে পারছ না?'

'উঁহুঁ চিনতে পারছি না। মনে কিছু কোরো না বাপু, জীবনে যত চাঁদবদন দেখেছি, সবাইকে মনে রাখতে পারে কেবল শয়তানেই!'

'গলোপুপেঙ্কোর ছেলেকে মনে নেই!'

'তুমি তাহলে অখ্রিমভের ছেলে?'

'তা ছাড়া কে? ভূত তো আর নই।'

অমনি টুপি খুলে চুম্বন বিনিময় হল। আমাদের গলোপুপেঙ্কোর ব্যাটা একমুহূর্ত নষ্ট না করেই তার নতুন পাওয়া পূর্বপরিচিতের ওপর আক্রমণ চালাবে ঠিক করল।

বলল, 'বলছিলাম কী সলোপি, দেখছই তো, আমি আর তোমার মেয়ে, দুজন দুজনকে এমন ভালোবেসেছি যে সারাজীবনই একসঙ্গে কাটাবার ইচ্ছে।'

মেয়ের দিকে ফিরে হেসে বললে চেরেভিক, 'তা পারাস্কা, হয়তো তাই হবে আর কী, তোমরা দুটিতে, সেই যে বলে, এক মাঠেই চরবে। তাহলে কী? কথা পাকা? তাহলে আমার নতুন জামাই, মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও!'

সুতরাং তিনজনেই গিয়ে হাজির হল শামিয়ানার তলে মেলার বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে, এটির মালিক একজন ইহুদিনী, নানা চেহারা ও নানা আকারের অসংখ্য শিশি, বোতল সুরাপাত্রের এক অক্ষৌহিণীতে সুসজ্জিত।

'শাবাশ জামাই, এইজন্যেই ভালোবাসি!' বলল চেরেভিক একটু নেশার ঝোঁকে, যখন দেখল তার ভাবী জামাই মগে সের-দেড়েক মদ ঢেলে এক নিশ্বাসে সাবাড় করে মগটাকে ভেঙে গুঁড়ো করল, 'কী বলিস, পারাস্কা? তোর জন্য কেমন বর জুটিয়েছি দ্যাখ। কেমন বাহাদুরের মতো ভোদকা টানে দেখেছিস!'

হাসতে হাসতে টলতে টলতে মেয়েকে নিয়ে সে যাত্রা করল নিজের গাড়ির দিকে, আর আমাদের ছেলেটি গেল মনিহারি দোকানগুলোর সারির দিকে; পলতাভা গুবের্নিয়ায় বিখ্যাত দুই শহর, গাদিয়াচ আর মিরগরোদ থেকেও ব্যাপারিরা আসে এখানে, খোঁজ করতে লাগল শৌখিন তামা-বাঁধাই কাঠের পাইপ, লাল জমির ওপর ফুলতোলা মাথার রুমাল আর টুপি— শ্বশুর এবং অন্যান্য যাদের দেওয়া দরকার তাদের জন্য বিয়ের প্রণামী।

৪

স্বামী যত চাক এইটে,
বউ যদি চায় ওইটে,
বুঝে নাও কিবা ঘটবে...

কৎলিয়ারেভস্কি

'শোনো বউ, মেয়ের বর পেয়েছি!'

'দ্যাখো একবার, বর খোঁজার সময় বটে! হাঁদা, হাঁদা একেবারে! চিরকাল হাঁদাই থেকে যাবি, এই তোর কপালে লেখা! এই সময় ভালোমানুষে বর খুঁজতে বেরিয়েছে এ তুই কবে দেখেছিস, কবে শুনেছিস? কোথায় গমটা খালাস করার কথা ভাববে, তার বদলে দ্যাখো কাণ্ড; আর বরও এখানে জুটবে ভালোই! কোথাকার ভুখানাঙা কাঙাল হবে একটা নিশ্চয়।'

'কী যে বলিস গো, মোটেই তা নয়! ছেলেটি কেমন একবার দেখলে পারতিস! ওর ওই চাপকানটারই দাম হবে তোর সবুজ জামা আর লাল বুটজোড়ার চেয়ে বেশি। আর মদ টানতে পারে কেমন, শয়তানের দিব্যি, সারাজীবনেও কখনো দেখিনি যে, ছেলেছোকরা বয়স, একটানে সের দেড়েক মদ শেষ করে, মুখ এতটুকু কোঁচকায় না।'

'তা তো বটেই, মেদো মাতাল ভবঘুরে হলেই ঠিক ওর মনের মতন। বাজি রেখে বলতে পারি, এ ওই হারামজাদাটা, সাঁকোর উপর যে আমাদের সঙ্গে মশকরা লাগিয়েছিল। সামনে একবার পেলে হয়, টের পাইয়ে ছাড়ব।'

'কী বলছিস গো হিভ্রিয়া, নয় সেইটেই হল, কিন্তু হারামজাদা হবে কেন?'

'শোনো কথা, হারামজাদা হবে কেন! ওরে মাথা মোটা! শোনো একবার হারামজাদা হবে কেন! মিলের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন তোর হাঁদা গঙ্গারাম চোখদুটো ছিল কোথায়? ওর নস্যিমাখা নাকের ডগায় বউকে লোকে অপমান করে যায়, আর ওর তাতে বয়েই গেল!'

'যাই বলো, আমার তো খারাপ কিছু মনে হয় না; কী চমৎকার ছোকরা! তোর পোড়ার মুখে গোবর ছুড়ে মেরেছিল, তা ছাড়া তো কিছু নয়।'

'বটে, আমার কথা বলাও চলবে না দেখছি! এর মানে কী? কী হল তোর? কিছু বেচা হতে-না-হতেই দেখছি মদ টেনে এসেছিস...'

এই সময় চেরেভিক নিজেই টের পেল যে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মুহূর্তেই দুই হাতে মাথা ঢাকল সে, নিশ্চয়ই অনুমান করেছিল যে তার ক্রুদ্ধা সহধর্মিণী স্ত্রীসুলভ নখরে তার চুল চেপে ধরতে বিলম্ব করবে না।

'চুলোয় যাক গে! বিয়ের দফা শেষ!' বউয়ের চামুণ্ডা হামলার সামনে পিছিয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবল সে, 'কারণ নেই, কৈফিয়ৎ নেই, 'না' করে দিতে হবে ভালো

ছেলেটাকে। হায় ভগবান, আমাদের পাপীতাপীদের ওপর কেন এই অভিশাপ। এমনিতেই তো কত ওঁছা মালে দুনিয়া ভরা, তার ওপর আবার বউ কেন গড়লে ভগবান।'

৫

ম্যাপ্‌ল্ গাছ তুই হেলিস না,
সবুজ যে তোর ফুরোয়নি;
কসাক ভাই, তুই দমিস না,
বয়স যে তোর বুড়োয়নি!

মালোরুশীয় গান

সাদা চাপকান-পরা ছেলেটি তার গাড়ির উপর বসে আনমনে তাকিয়েছিল তার চারপাশের একটানা কোলাহলী জনতার দিকে। শ্রান্ত সূর্য সকাল-দুপুর শান্তভাবে জ্বলে জ্বলে এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে; নিভন্ত দিন আরক্ত হয়ে উঠেছে মনোহর জ্বলজ্বলে আভায়। সাদা সাদা তাঁবু আর শামিয়ানার মাথাগুলো চোখ ধাঁধিয়ে ঝকঝক করছে, তাদের উপর দুর্লক্ষ একটা আগুনে-গোলাপি আলো। বিক্রির জন্য গাদা করে রাখা জানলার শার্শিগুলো জ্বলছে; শুঁড়ি-বউদের দোকানের টেবলে সবুজ সুরাধার ও পেয়ালাগুলো ঝলক দিচ্ছে শিখার মতো। তরমুজ, ফুটি আর কুমড়োর ঢিপগুলো মনে হয় যেন সোনা আর ময়লাটে তামা থেকে ঢালাই করা। কথাবার্তা এখন স্পষ্টতই হয়ে উঠেছে স্বল্পতর ও ভাঙাভাঙা; ফড়িয়া, চাষি আর বেদেদের জিভ চলছে ধীরে ধীরে, আলস্যে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বলতে শুরু করেছে, মাংস রান্নার উপাদেয় ভাপ বয়ে আসছে শান্ত হয়ে আসা রাস্তায়।

'মন ভার কেন, রে গ্রিৎসকো?' রোদপোড়া এক লম্বা বেদে আমাদের ছোকরাটির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'কী বলিস, কুড়ি দিচ্ছি, তোর বলদজোড়া বেচে দে!'

'তোর কেবল ওই বলদ আর বলদ। তোদের জাতটার নজরই শুধু লাভের দিকে। ভালো লোকদের ঠকিয়ে বেড়াস।'

'বাপরে, একেবারে ব্রহ্মদত্যি! তিরিক্ষি মেজাজ তো আর অমনি অমনি নয়। কী রে, কনে-টনে ঘাড়ে চাপিয়েছিস বলেই মন খারাপ নাকি?'

'উঁহুঁ, আমার সে স্বভাব নয়; কথার খেলাপ আমি করি না; যদি কিছু করি তো করি চিরজন্মের মতো। আর ওই দ্যাখ না, ধেড়ে ছুঁচো চেরেভিকটার বোঝাই যাচ্ছে বিবেকও নেই, ট্যাঁকে কড়িও নেই; 'হ্যাঁ' বলে আবার কথা ঘুরুলে... তবে ওকে আর দোষ দেব কী, একেবারে মাথামোটা। এ সবই ওই বুড়ি ডাইনিটার কাণ্ড, সেতুর উপর যেটাকে আমরা ছেলে-ছোকরা সবাই খুব একচোট গালমন্দ

করেছিলাম! ইশ্, যদি জার বা কোনো হোমরাচোমরা জমিদার হতাম তো মাগী-ন্যাওটা সব কটা আহাম্মককে ফাঁসিতে ঝোলাতাম...'

'আর যদি তোর জন্যে পারাস্কাকে জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে কুড়ি রুবলে ছেড়ে দিবি বলদজোড়া?'

বিমূঢ়ভাবে গ্রিৎস্কো তাকাল তার দিকে। বেদেটার ময়লাটে মুখখানায় কী একটা যেন ছিল যা কেমন হিংস্র, বিষাক্ত, নীচ এবং সেইসঙ্গেই দর্পিত; তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই আশ্চর্য মনটা ভেতরে ভেতরে মহৎগুণে টগবগ করছে, তবে পৃথিবীতে তার একটিমাত্র পুরস্কারই বর্তমান— ফাঁসিমঞ্চ। নাক আর ছুঁচলো থুতনির মাঝখানে একেবারে বসে-যাওয়া মুখটা, তাতে অবিরাম একটা বাঁকা হাসি, অনতিবৃহৎ চোখ কিন্তু আগুনের মতো জীবন্ত, মুখের ওপর ফন্দিফিকিরের অবিরত বিদ্যুৎঝলক— এ সবই যেন সে তখন যে বিশেষ রকমের অদ্ভুত একটা পোশাক পরেছিল তার সঙ্গে খুবই মানানসই। তার গাঢ় বাদামি যে কাফতানটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তা ছুঁলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়বে, কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে যে ঝাঁকড়া কালো চুল, তার অনাবৃত রোদপোড়া পায়ের নাগরা— এ সবই যেন তার গা থেকে গজিয়েছে, তার স্বভাবেরই একটা অঙ্গ।

'যদি ধোঁকা না দিস তাহলে কুড়ি নয়, পনেরোতেই ছেড়ে দেব।' বেদেটার মুখ থেকে তার সন্ধানী দৃষ্টি না সরিয়েই বলল ছেলেটা।

'পনেরোতেই? ভালো কথা। তবে দেখিস, মনে রাখিস পনেরো! এই নে আগাম রইল পাঁচ রুবল!'

'কিন্তু যদি ধোঁকা দিস?'

'ধোঁকা দিলে ওটা তোরই রইল!'

'বেশ, তাহলে হাতে হাত!'

'হাতে হাত!'

৬

এই সর্বনাশ, রোমান আসছে,
এসেই আমার হাড় ভাঙবে
আর আপনি জমিদারবাবু হোম
আপনিও ছাড়ান পাবেন না।

মালোরুশীয় কমেডি থেকে

'এই দিক দিয়ে আফানাসি ইভানভিচ, বেড়াটা এই দিকে নিচু; পা তুলুন, ভয় নেই, আমার বোকামণিটি গেছে তার স্যাঙাতের সঙ্গে সারারাতের মতো, গাড়ির নিচে ঘুমুবে, মস্কালরা কিছু যাতে মেরে না দেয়।'

চেরেভিকের চামুণ্ডা সহধর্মিণী এই বলেই মিষ্টিসুরে সাহস দিল পাদরিপুত্রকে, বেড়ার কাছে ভয়ে ভয়ে ঘুরঘুর করছিল সে, এবার বেড়ার উপর উঠে একটা দীর্ঘ ভয়ঙ্কর প্রেতমূর্তির মতো অনেকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দিয়ে আন্দাজ করল কোথায় লাফ দেওয়া যায় এবং শেষপর্যন্ত ধপাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঘাসপাতার মধ্যে।

'কী সর্বনাশ! লাগেনি তো, ভগবান রক্ষা করুন, হাড়গোড় ভাঙেনি তো?' থতমত খেয়ে বলল আমাদর সশঙ্কিতা হিভ্রিয়া।

'আস্তে! কিছু না, কিছু হয়নি গো লক্ষ্মীমণি, হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা!' পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ব্যথাতুর অস্ফুট কণ্ঠে বলল পাদরিপুত্র, 'শুধু ওই আমাদের স্বর্গগত বড় পাদরি যা বলতেন, এই সর্পসদৃশ লতা বিছুটির কামড়টুকু ছাড়া।'

'চলুন, চলুন এবার ঘরে যাই। সেখানে কেউ নেই। আমার তো ভাবনা হয়েছিল আফানাসি ইভানভিচ, হয়তো আপনার পিত্তিদোষ কি পেটের অসুখ শুরু হয়েছে। সেই যে দেখা নেই, তো দেখাই নেই। কেমন আছেন গো? শুনেছি, আপনার পিতাঠাকুর এটা-ওটা অনেক পেয়েছেন!'

'বিশেষ কিছু নয় হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা। বাবা সর্বসমেত এই গোটা পার্বণটার জন্য পেয়েছেন পনেরো বস্তা গম, বস্তাচারেক মিলেট, শতখানেক রুটি, আর মুরগি যা পেয়েছেন তা গুনে দেখলে পঞ্চাশও হবে না, আর ডিমগুলোর অধিকাংশই তো খারাপ। কিন্তু সত্যিকারের মধুর দক্ষিণা, বলা যেতে পারে, কেবল আপনার কাছ থেকেই মিলবে হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা!' সস্নেহে তাকাতে তাকাতে আরো কাছ ঘেঁসে এসে বলল পাদরিপুত্র।

'এই নিন আপনার দক্ষিণা, আফানাসি ইভানভিচ!' টেবিলের উপর কয়েকটা পাত্র রেখে সে বলল। ন্যাকামি করে ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগল এমনভাবে যেন এতক্ষণ যে সেটা খোলা ছিল তা ঠিক ইচ্ছে করেই নয়, 'ছানার পিঠে, ময়দার পুলি, কেক, সুজি!'

'বাজি রেখে বলতে পারি ইভ-কন্যাদের মধ্যে সবার সেরা নিপুণ যার হাত, সেই হাতে বানানো!' এক হাতে সুজি নিয়ে অন্য হাত পিঠের দিকে বাড়িয়ে বলল পাদরিপুত্র, 'তাহলেও হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা, মন আমার লোলুপ হয়ে আছে আপনার সমস্ত পিঠেপুলির চেয়েও মিষ্টি একটি খাদ্যের জন্য।'

'কিন্তু আমি তো জানি না, আফানাসি ইভানভিচ, আর কোনো খাদ্যের ইচ্ছে আপনার!' না-বোঝার ভান করে বলল আমাদের পুরুষ্টু সুন্দরী।

'বলাই বাহুল্য, আমার অতুলনীয়া হাভ্রোনিয়া নিকিফরভনা, আপনার প্রেম!' এক হাতে পিঠে এবং অন্য হাতে তার প্রশস্ত কোমর জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল পাদরিপুত্র।

'ভগবান জানেন, আফানাসি ইভানভিচ, কী যে আপনার মতলব!' সলজ্জে চোখ নামিয়ে বলল হিভ্রিয়া, 'এরপর আবার চুমু খেতে চাইবেন হয়তো, কে জানে!'

'কথা যখন উঠল তখন নিজের সম্পর্কেই শোনাই', বলে চলল পাদরিপুত্র, 'আমার জীবনে, সত্যি বলতে কী আমার শাস্ত্রশিক্ষার সময়েই, একেবারে যেন এই সেদিনের ঘটনা বলে মনে পড়ছে...'

এই সময় আঙিনায় কুকুরের ডাক আর ফটকে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। হিভ্রিয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়েই ফিরে এল একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে।

'আফানাসি ইভানভিচ, আমাদের দফা শেষ! দরজায় ঘা দিচ্ছে একদল লোক, মনে হল যেন আমাদের স্যাঙাতের গলাও শুনলাম...'

পাদরিপুত্রের গলায় পিঠে আটকে গেল... চোখ ড্যাবডেবে হয়ে উঠল তার, যেন পরপার থেকে এইমাত্র কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দর্শন দিতে।

'উঠে পড়ুন এইখানে!' চেঁচিয়ে উঠল ভীতা হিভ্রিয়া, ঠিক ছাতের নিচে দুই কড়িকাঠের উপর পাতা যে তক্তাটার উপর যতকিছু সাংসারিক টুকিটাকি টিপ করা ছিল সেইখানটা দেখিয়ে দিল সে।

বিপদে সাহসী হয়ে উঠল আমাদের নায়ক। খানিকটা কী ভেবে নিয়ে সে গিয়ে চাপল চুল্লির উপর, তারপর সেখান থেকে সেঁধল তক্তাটার উপরে আর দিশেহারা হয়ে হিভ্রিয়া ছুটল ফটকের দিকে, কেননা করাঘাত সেখানে আরো প্রবল ও অধীর হয়ে উঠেছিল।

৭

আশ্চর্য কাণ্ড, হুজুর!

মালোরুশীয় কমেডি থেকে

মেলায় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে : চতুর্দিকে গুজব শোনা গেল পশরাপাতির মাঝখানে কোথায় যেন লাল কোর্তাকে দেখা গেছে। রুটিওয়ালি এক বুড়ির কাছে শয়তান দেখা দিয়েছে শুয়োরের রূপে, অনবরত গাড়িগুলোর ওপর সে শুয়োর ঝুঁকে ঝুঁকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইতিমধ্যেই নিঝুম হয়ে আসা এলাকাটার সর্বপ্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা এবং যদিও রুটিওয়ালির চলন্ত দোকানটা ছিল শুঁড়িখানার পাশেই এবং সারাদিন অকারণেই সে সেলাম ঠুকছিল সবাইকে, টলটলায়মান পা দিয়ে সে তার মুখরোচক রুটিগুলোর মতোই সব নানা মূর্তি আঁকছিল মাটিতে, তাহলেও কথাটা অবিশ্বাস করা অপরাধ বলেই মনে হল সবার। এর সঙ্গে যুক্ত হল ভাঙা চালার কাছে সেরেস্তাদারের দেখা অবাক কাণ্ডটার অতিরঞ্জিত সংবাদ, ফলে রাতের দিকে সবাই পরস্পর গা ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকাই

শ্রেয় বোধ করল; মনের শান্তি চুলোয় গেল; ভয়ে চোখের পাতা বন্ধ করার সাহস হল না কারো। যাদের বিশেষ বীরত্ব ছিল না, এবং আগেই কোনো ঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা রেখেছিল, তারা চলতে শুরু করল ঘরমুখো। এই শেষের দলে ছিল চেরেভিক, আর তার মেয়ে ও স্যাঙাত, তাদের সঙ্গে অনাহূত অভ্যাগত হিসেবে যারা জুটে গিয়েছিল তারাই ওই করাঘাত শুরু করে যাতে অমন ভয় পেয়ে যায় আমাদের হিভ্রিয়া। স্যাঙাত ইতিমধ্যেই একটু টং হয়েছিল। সেটা বোঝা যায় এই দেখে যে সে বাড়িটা ঠাহর করার আগে দুবার তার সামনে দিয়েই গাড়ি হাঁকায়। অভ্যাগতরাও বেশ ফুর্তির মেজাজেই ছিল, গৃহস্বামীর আগেই তারা অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সবাই যখন ঘরের চারিপাশ ভরে ফেলেছে ততক্ষণে হিভ্রিয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে শরশয্যার মতো।

'কী হল স্যাঙাত-বৌ!' ঘরে ঢুকে স্যাঙাত, 'তোর বুঝি এখনো কম্পজ্বর চলছে?'

'হ্যাঁ গো, শরীর ভালো নেই', ছাতের তলের তক্তটার দিকে অস্বস্তির দৃষ্টিপাত করে বললে হিভ্রিয়া।

'যা বউ, গাড়ি থেকে একটা বোতল নিয়ে আয়!' স্যাঙাত বলল তার সহগামিনী বউকে, 'ভালোমানুষদের সঙ্গে ওটা শেষ করা যাক। হতভাগা মাগীগুলো আমাদের এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে বলতেও লজ্জা হয়। হে ভগবান, যত বাজে হুজুগে আমরা সব চলে এলাম ভায়া!' মেটে পেয়ালাটা শেষ করে সে বলে চলল, 'নতুন একটা টুপি বাজি— এ নিশ্চয় ওই মাগীগুলোর ফন্দি, আমাদের নিয়ে মজা করার ছল। ধর যদি শয়তানই হয়, কী হল! শয়তান আবার কে। ঝাঁটা মারি তার মাথায়! যদি এক্ষুণি ও এসে, ধরো, আমার সামনেই দাঁড়ায়, তাহলে ঠিক ওর নাকের উপর যদি একটা গাঁট্টা না বসাই তো আমি কুত্তার বাচ্চা!'

'তাহলে অমন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছলি যে', বলল অভ্যাগতদের একজন, মাথায় সে সবচেয়ে লম্বা, সর্বদাই সাহসের ভাব দেখাতে চায়।

'আমি?... বলিস কী! স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?'

অভ্যাগতরা হেসে উঠল। বাক্যবীরটির মুখেও ফুটে উঠল তুষ্টির হাসি।

'এখন আর ওর ফ্যাকাসে হবার জো কোথায়!' টিপ্পনী কাটল আরেক জন। 'গাল ওর দেখ না পপিফুলের মতো লাল। এখন আর ও ৎসিবুলিয়া* নয় একেবারে লাল বিট, বলতে কী একেবারে ওই খোদ লাল কোর্তার মতো; লোকে যার ভয়ে মরছে।'

বোতলটা টেবিল ঘুরতেই অতিথিরা আগের চেয়েও হাসিখুশি হয়ে উঠল। লাল কোর্তার ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই আমাদের চেরেভিককে মনঃপীড়া দিচ্ছিল, তার সদা-কৌতূহলী মনটা মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছিল না। স্যাঙাতকে সে বলল, 'নে বাপু স্যাঙাত, দয়া করে ব্যাপারটা কী বল্ তো। তোর এই লাল কোর্তার কাহিনীটা জিগ্যেস করে করেও কিছুতেই আর শোনা হয়ে উঠল না।'

* আক্ষরিক অর্থে পেঁয়াজ।

'হেঁ, হেঁ, স্যাঙাত! ওসব কথা রাতে বলা ঠিক নয়। তবে তোর জন্য আর এই ভালো লোকদের জন্য' (কথাটা সে বলল অভ্যাগতদের উদ্দেশ করে), 'দেখছি এরা সকলেই তোরই মতো ভুতুড়ে কাণ্ডটা যখন শুনতে চাইছে, তখন তাই হোক। শোন্ তবে।'

এই বলে সে কাঁধ চুলকিয়ে, আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে দুই হাত টেবিলে রেখে শুরু করল :

'একবার, ভগবান জানেন কী একটা দোষ করায় একটা শয়তানকে নরক থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়।'

'সে কি স্যাঙাত', বাধা দিল চেরেভিক, 'নরক থেকে শয়তানকে ভাগিয়ে দিল, এটা হয় কী করে?'

'ভাগিয়ে দিলে তো আমি তার কী করব স্যাঙাত, ভাগিয়ে দিল লোকে যেমন করে কুকুর খেদায় বাড়ি থেকে। হয়তো কোনো একটা ভালো কাজটাজ করতে চেয়েছিল আর কী, ব্যস দরজা দেখিয়ে দিল। বেচারি শয়তানটার এমন মন কেমন করে, হাপিত্যেশ করে নরকের জন্য, গলায় দড়ি দেবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু কী আর করে? মনের দুঃখে মদ ধরল। ডেরা পাতল ওই চালাটায়, যেটা ভেঙে পড়েছে ওই টিলার নিচে, তুই দেখেছিস, কোনো ভালোমানুষ এখন আর ওর সামনে ক্রশের পবিত্র চিহ্ন না দিয়ে যাবে না, শয়তানটাও এমন নেশাখোর হয়ে উঠেছে যে কোনো ছেলেছোকরার মধ্যেও তেমনটি দেখবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই এক কাজ— শুঁড়িখানায় বসে বসে মদ গেলা!...'

এইখানটায় আমাদের বিচারপ্রবণ চেরেভিক ফের কাহিনীকারকে থামাল :

'তুই যে কী বলছিস স্যাঙাত, ভগবান জানেন! শয়তানকে শুঁড়িখানায় ঢুকতে দিল যে বড়! সেটা হয় কী করে। যতই হোক, ভগবান রক্ষা করুন, শয়তানের মাথায় তো শিঙ আর হাতের থাবায় বড় বড় নখ রয়েছে যে।'

'আরে ওই তো মজা, মাথায় যে ছিল টুপি, আর হাতে দস্তানা। কে ওকে তখন চিনবে। মদ টানে আর টানে, শেষপর্যন্ত পকেটে যা ছিল সবই খেয়ে উড়িয়ে দিল। শুঁড়ি অনেকদিন বিশ্বাস করে তাকে মদ দিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর দেয় না। তখন শয়তানকে তার লাল-কোর্তাটা বাঁধা রাখতে হল ইহুদিটার কাছে, সরোচিনেৎস মেলায় তখন সে শুঁড়িখানাটা চালাত, বাঁধা রাখল দামের তিন ভাগের এক ভাগেও নয়। বলে, "দেখিস ইহুদি, কোর্তাটা ছাড়াতে আসব ঠিক এক বছর পরে, সামলে রাখিস!" তারপর উধাও, একেবারে বেপাত্তা। কোর্তাটাকে ভালো করে দেখল ইহুদি, কাপড়টা এমন যে তোমার মিরগরোদেও তা মিলবে না। আর লাল রঙ জ্বলছে কী, যেন আগুন, চোখ আর ফেরানো যায় না! বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর তর সইল না ইহুদিটার। মাথা চুলকিয়ে টুলকিয়ে শেষপর্যন্ত এক যাত্রী জমিদারবাবুর কাছে কম করে পঞ্চাশ রুবলে ছেড়ে দিল। মেয়াদের কথাটা ইহুদি একেবারে ভুলে বসেছিল। কিন্তু একদিন সন্ধেয় কে

একটা লোক এসে হাজির। বলে, "দে ইহুদি আমার কোর্তা।" ইহুদি প্রথমটা চিনতে পারেনি, পরে ভালো করে ঠাহর করার পর ভাব করতে লাগল যেন জীবনেও তাকে দেখেনি। "কিসের কোর্তা? কোনো কোর্তা আমার কাছে নেই। তোর কোর্তার বিন্দুবিসর্গ আমি কিছু জানি না।" শয়তানটা খানিক তাকিয়ে থেকে চলে গেল। তবে সন্ধ্যায়, ইহুদি যখন তার ঝাঁপ বন্ধ করে, পয়সাকড়ি গুণেগেঁথে প্রার্থনা শুরু করেছে, হঠাৎ শোনে খচমচ শব্দ, তাকিয়ে দেখে, সবকটি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে শুয়োরের মুখ...'

এই সময় সত্যি সত্যিই কী একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, হুবহু একেবারে শুয়োরের ঘোঁৎঘোঁতানির মতো; সবাই ফ্যাকাসে হয়ে উঠল... গল্পকারের মুখে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'কী ওটা?' ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল চেরেভিক।

'ও কিছু নয়!...' সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে বলল তার স্যাঙাত।

'স্-স্-স্!' সাড়া দিল অভ্যাগতদের একজন।

'তুই বললি কিছু?...'

'উঁহুঁ!'

'তবে ঘোঁৎঘোঁৎ করল কে?'

'ভগবান জানেন, এমন আঁতকে ওঠবার কী আছে! কেউই নেই!'

ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল সবাই, কোণের দিকে ঘেঁসতে লাগল। হিভ্রিয়ার একেবারে জীবন্মৃত অবস্থা।

গলা উঁচিয়ে সে বলল, 'ছি, ছি, তোমরা সব মাগীরও অধম! এই তোমরা কসাক, এই তোমরা মরদ! হাতে তকলি নিয়ে তোমাদের সুতো কাটতে বসা উচিত। কেউ হয়তো, ভগবান মাপ করুন, মানে কারো হয়তো তক্তপোশটোশ হয়তো একটু ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠেছে অমনি সবাই তোমরা ভেড়ার পালের মতো হুড়োহুড়ি লাগিয়েছ!'

এতে আমাদের বীরপুরুষদের লজ্জাবোধ হল, একটু চাঙা হয়ে উঠল সবাই; মগে চুমুক দিয়ে স্যাঙাত ফের গল্পের সূত্র তুলে ধরল :

'ইহুদি তো মূর্ছা গেল। শুয়োরগুলো কিন্তু রণপায়ের মতো লম্বা লম্বা পায়ে জানালা বেয়ে উঠে তোমার তিন বিনুনির চাবুক দিয়ে এক দণ্ডেই জাগিয়ে তুলল তাকে। ইহুদি তো লাফাতে শুরু করল তোমার ওই কড়িকাঠগুলোও ছাড়িয়ে। পায়ে লুটিয়ে পড়ল ইহুদি, সবকিছু কবুল করল ... তবে কোর্তা তো আর সহজে মিলবার নয়। রাস্তায় জমিদারবাবুর ওপর ডাকাতি করে কোনো এক বেদে, ব্যাপারি-মেয়ের কাছে বেচে দেয়। ব্যাপারি-মেয়ে সেটা ফের নিয়ে আসে সরোচিনেৎস মেলায়, কিন্তু সেই থেকে তার আর কিছুই বিক্রি হয় না। ভয়ানক তাজ্জব লাগে মাগীটার, ভেবে ভেবে শেষপর্যন্ত তার খেয়াল হল, নিশ্চয় ওই লাল

কোর্তাটাই অপয়া। জামাটা একবার সে পরে দেখেছিল, মনে হয়েছিল কে যেন তাকে একেবারে চারিদিক থেকে চেপে ধরছে, সে তো আর খামকা নয়। বেশিক্ষণ আর ভাবনাচিন্তা না করে জামাটি সে আগুনে ফেলে দিল— অলপ্পেয়ে জামাটা কিন্তু কিছুতেই পোড়ে না। 'কাণ্ড দেখ, ও নিশ্চয় শয়তানের দেওয়া!' মাগীটা বুদ্ধি করে জামাটা এক চাষির গাড়ির মধ্যে গুঁজে দেয়। চাষিটা এসেছিল মাখন বিক্রি করতে। দেখে ভারি খুশি হয়ে গেল বোকাটা, তবে তার মাখনের দরটা পর্যন্ত কেউ জিগ্যেস করেও দেখতে চায় না। 'কে জানে কোন্ অলক্ষুণে এই জামাটা দিয়েছে গো!' কুড়ুল নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটল জামাটাকে। দেখে কী, টুকরোয় টুকরোয় জুড়ে গিয়ে যেমন কোর্তা ফের তেমনি। এবার সে ক্রশ করে ফের কুড়ুলটা টেনে নিল, টুকরোগুলো সারা এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই থেকে প্রতি বছর আর ঠিক মেলাটির সময়েই শয়তান এসে সারা জায়গাটা ঢুঁড়ে বেড়ায়, শুয়োরের রূপ ধরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে খুঁজে বেড়ায় তার কোর্তার টুকরোগুলো। লোকে বলে, সবই নাকি পেয়ে গেছে— বাকি আছে কেবল বাঁ হাতের আস্তিনটা। সেই থেকে লোকে জায়গাটা থেকে ক্রশ করে পালায়, আর এই দশবছর হল এই জায়গাতে মেলা বসেনি। সত্যি, ছোট হাকিম যে কোন্ শনির টানে এই ...'

বাকি কথাটা কাহিনীকারের ঠোঁটেই জমে গেল।

সশব্দে খুলে গেল জানলা, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাচ, আর একটা ভয়ঙ্কর দর্শন শুয়োরের মুখ দেখা দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে যেন-বা জিগ্যেস করল, 'হেথায় কী করেছ গো সব ভালোমানুষেরা?'

৮

... লেজ গুটিয়ে ঠিক কুকুরের পারা,
খুনির মতো ঠকঠকিয়ে কম্পিত,
নাকেতে ঝরে নস্য সিক্ত ধারা।
কথলিয়ারেভস্কি 'এনেইদা'।

ঘরের সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেল আতঙ্কে। মুখ হাঁ-করা অবস্থাতেই যেন পাথর হয়ে গেল স্যাঙাত; চোখদুটো তার বেরিয়ে এল, মনে হল বুঝি-বা গোলার মতো ছুটে যাবে; প্রসারিত আঙুলগুলো শূন্যেই নিশ্চল হয়ে রইল। লম্বাপানা বীরপুরুষটি দুর্নিবার বিভীষিকায় ঝট করে লাফিয়ে উঠতেই মাথায় ধাক্কা খেল কড়িকাঠে। ফলে তক্তাগুলো সরে গেল এবং পাদরিপুত্র সশব্দে ধপাস করে পড়ল মাটিতে। আঁ-আঁ-আঁ করে মরিয়ার মতো আর্তনাদ করে উঠল একজন, আতঙ্কে তক্তপোশের উপর থেবড়ে বসে পড়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল সে। 'কে আছ বাঁচাও গো!' বলে আরেকজন গা ঢাকা দিল মেষচর্মের নিচে।

এই দ্বিতীয় বিভীষিকার ধাক্কায় স্যাঙাতের আড়ষ্টতা ঘুচে গেল, বউয়ের ঘাগরার তলে লুকিয়ে সে কাঁপতে লাগল। লম্বাপানা বীরপুরুষটি গিয়ে ঢুকল একেবারে চুল্লির ভেতরে, এবং খোঁদলটা নিতান্ত অপরিসর হলেও কোনোরকম সেঁধিয়ে ঢাকনা এঁটে দিল। আর চেরেভিক ঠিক যেন ফুটন্ত জলের ছ্যাঁকা খেয়ে টুপির বদলে একটা হাঁড়ি মাথায় দিয়ে ছুটে গেল দুয়োরের দিকে, উন্মত্তের মতো দৌড়তে লাগল দিশেহারা হয়ে; ধাবনের বেগ কিছুটা কমল কেবল ক্লান্তির চাপে। বুক তার ধড়াস ধড়াস করছিল ঠিক ঢেঁকির পাড়ের মতো, ঘাম ঝরছিল অঝোরে। অবসন্ন হয়ে এমনিতেই সে মাটিতে পড়ে যেত, হঠাৎ কানে এল কে যেন ছুটে আসছে তার পেছন পেছন ... নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার ...

'শয়তান! শয়তান!' প্রাণপণ শক্তিতে জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে এবং পরমূহূর্তেই অসাড় হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে। তার পেছনেও শব্দ উঠছিল 'শয়তান! শয়তান!' এইটুকু সে শুনল কী যেন সশব্দে নিপতিত হল তার উপর। তারপরই জ্ঞান হারাল সে, সংকীর্ণ কফিনের এক ভয়াবহ বাসিন্দার মতো নির্বাক নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল রাস্তার মাঝখানে।

৯

সামনে থেকে এমন কিছু নয়; কিন্তু পেছন থেকে, বাপরে, একেবারে শয়তানের মতো!

লৌকিক কাহিনী

'শুনছিস, ভ্লাস!' রাস্তার উপর ঘুমন্ত একদল লোকের মধ্যে থেকে একজন উঠে বসে বলল, 'কাছাকাছি কে একজন শয়তানের নাম নিচ্ছিল!'

পাশেই যে বেদেটা শুয়েছিল সে পা টান করে বিড়বিড় করল, 'বয়েই গেল আমার! শয়তানদের গোটা জাতটারই নাম নিক না কেন।'

'কিন্তু এমনভাবে চেঁচাল যেন টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ!'

'ও ঘুমের মধ্যে লোকে তো কত কীই চ্যাঁচায়!'

'সে যাই বলো, অন্তত একবার দেখা দরকার। নে চকমকি ঠোক!'

দ্বিতীয় বেদেটা আপন মনে কী গজর গজর করে উঠে দাঁড়াল, বারদুয়েক বিদ্যুতের মতো ফুলকির ঝলকে আলো হয়ে উঠল তার মুখ, ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন জ্বালাল এবং হাতে 'কাগানেৎস' অর্থাৎ একটা ভাঙা খোলায় ভেড়ার চর্বি দিয়ে জ্বালানো প্রচলিত মালেরুশীয় বাতি নিয়ে পথ আলো করে যাত্রা করল।

'দাঁড়া তো, এখানে কী যেন পড়ে আছে; আলো দেখা তো!'

এই সময় আরো কিছু লোক জুটল তাদের সঙ্গে।

'কী পড়ে আছে রে ভ্লাস?'

'দুটো লোকের মতো মনে হচ্ছে; একটা উপরে, আরেকটা তলে; এদের কোন্‌টা যে শয়তান ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।'

'ওপরেরটা কে?'

'একটা মাগী!'

'তবে তো ঠিকই, শয়তানই বটে!'

সকলের হো হো হাসিতে প্রায় গোটা রাস্তাটাই জেগে উঠল।

'আরে মাগী উঠেছে মদ্দার উপর; এ মাগীটা তাহলে চেপে যেতে জানে বলো!' ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল।

'আরে দ্যাখো হে, দ্যাখো, দ্যাখো!' চেরেভিকের মাথায় তখনো হাঁড়ির যে আধখানা লেগেছিল সেই খোলাটা তুলে বলল আরেক জন, 'কী টুপি পরেছিলেন বীরপুরুষটি!'

ক্রমবর্ধমান কোলাহল ও হাসাহাসিতে আমাদের মড়াদুটির সাড়া জাগল। সলোপি আর তার বউ তখনো বিগত আতঙ্কটায় পরিপূর্ণ, ফ্যালফ্যাল করে তারা সভয়ে তাকিয়ে রইল বেদেগুলোর কালচে মুখের দিকে; দপদপে ওই আলোর মিটমিটে ছটায় তাদের মনে হচ্ছিল যেন এক অনন্ত রাত্রির অন্ধকারে পাতালপুরীর গাঢ় বাষ্পে আচ্ছন্ন একদল উদ্দাম প্রেত।

১০

আলাই বালাই, দূর হ প্রেতচ্ছায়া!

মালোরুশীয় কমেডি থেকে

নিদ্রোত্থিত সরোচিনেৎস গ্রামের উপর সকালের তাজা আমেজ বয়ে গেল। সমস্ত চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল উদীয়মান সূর্যের অভিমুখে। কলকলিয়ে উঠল মেলা। শুরু হল ভ্যাড়ার ব্যা-ব্যা, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি; ফের হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁক আর পশারিনীদের চেঁচামেচি উঠতে লাগল সমস্ত এলাকা জুড়ে আর লাল কোর্তার ভয়াবহ যেসব গুজব আঁধারের রহস্যঘন সময়টায় লোকজনের মধ্যে অমন আতঙ্ক জাগিয়েছিল তা অন্তর্ধান করলে প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই।

হাই তুলে গা টান করে চেরেভিক তন্দ্রা উপভোগ করছিল তার স্যাঙাতের খড়ে ছাওয়া চালার নিচে, বলদ আর গম-ময়দার বস্তার মাঝখানে, মনে হচ্ছিল যেন তার স্বপ্নের আমেজটুকু ছেড়ে ওঠার কোনো ইচ্ছেই নেই, এমন সময় হঠাৎ যে কণ্ঠস্বরটি তার কানে এল সেটি তার আলস্যের আশ্রয়, লক্ষ্মীমন্ত চুল্লিটির মতোই, কিংবা তার ঘরের দুয়োর থেকে দশ পা দূরের দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার চালানো শুঁড়িখানাটার মতোই অতিপরিচিত।

'ওঠ! উঠে পড়!' প্রাণপণে হাত ধরে টানতে টানতে তার মমতাময়ী গৃহিণী তার কানের কাছে ঝঙ্কার তুলল।

উত্তর দেবার বদলে চেরেভিক গাল ফুলিয়ে দুই হাত ঢাক পিটানোর ভঙ্গিতে নাড়তে লাগল।

'আ মরণ! মাথা খারাপ হল নাকি!' আস্ফালিত যে হাতের ঘুসি আরেকটু হলেই তার মুখে এসে পড়ত তা থেকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল গিন্নি।

চেরেভিক উঠে বসে খানিকটা চোখ কচলে চারিদিকে চেয়ে দেখল, 'মাইরি বলছি গো, তোর মুখখানা আমার মনে হয়েছিল যেন একটা ঢাক, মস্কালদের মতো করে সেটা আমায় দমাদম পিটতে হুকুম দিয়েছে ওই সেই শুয়োরমুখোগুলো, আমাদের স্যাঙাত যাদের কথা বলছিল ...'

'হয়েছে, খুব হয়েছে। তোর যত বাজে কথার ভড়ং! উঠে যা এখনি ঘুড়িটাকে বেচতে। লোকে হাসবে যে : মেলায় এল একমুঠো তিসিও বেচল না।'

'সত্যি কী হবে বলো বউ', যোগ দিল সলোপি, 'আমাদের নিয়ে যে এবার লোকে হাসাহাসিই করবে।

'যা বাপু যা! লোকে এমনিতেই হাসবে তোকে দেখে!'

'দেখছিস তো এখনো হাতমুখও ধোয়া হয়নি', হাই তুলে পিঠ চুলকিয়ে বলল চেরেভিক এবং সেই ফাঁকে আলেসেমি করার মতো খানিকটা সময় জুটাবার চেষ্টা করল।

'দ্যাখো একবার, ফিটফাট হবার খেয়াল হল বাবুর কেমন সময়টিতে! ফিটফাট তুই কবে থেকেছিস? এই নে তোয়ালে, মুখ মুছে চলে যা...'

ওইখানেই জড়াপলটি কী একটা পড়েছিল, সেটাকে তুলে নিয়েই— আতঙ্কে ছুড়ে ফেলে দিল সে : এটা সেই লাল কোর্তার আস্তিন!

খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে সে দেখল তার স্বামীটি একেবারে আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁত তার ঠকঠক করছে। পুনরাবৃত্তি করল, 'যা বাপু, নিজের কাজে!'

ঘোড়াটা খুলে ময়দানের দিকে যেতে যেতে আপনমনে গজর গজর করল চেরেভিক, 'ভালোই বৌনি হবে এবার! এই হতচ্ছাড়া মেলাটায় আসার তোড়জোড় যখন করছিলাম তখনই কেমন বুক ভারভার লাগছিল, যেন পিঠে একটা মরা গরু চাপিয়ে দিয়েছে কে। সে তো আর খামকা নয়; বলদজোড়াও দু-দুবার ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তাতে আবার এই এতক্ষণে মনে হল, যাত্রা করেছি যে আবার সোমবারেই। ব্যস, সবেতেই শনির দৃষ্টি!... পোড়ামুখো শয়তানটারও বড় খুঁতখুঁতি। একটা আস্তিন নয় নাই রইল, পরলেই পারত বিনা আস্তিনে। তা নয়, যত ভালোলোকদের জ্বালাতন করে মারা। ধরো নয়, ভগবান রক্ষা করুন, আমিই যদি শয়তান হতাম, তাহলে ওই কতগুলো হতচ্ছাড়া ন্যাতার জন্যে রাত করে টুঁড়ে বেড়াতাম কখনো?'

এইখানে একটা কড়া হেঁড়ে গলায় আমাদের চেরেভিকের দার্শনিকতায় ছেদ পড়ল। সামনে তার দাঁড়িয়ে ছিল একটা লম্বা বেদে।

'কী বেচছ গো ভালোমানুষের পো?'

বিক্রেতা কিন্তু চুপ করে রইল, তারপর বেদেটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, না থেমে, লাগামটাতেও ঢিলে না দিয়ে শান্তভাবে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ কী বেচব!'

তার হাতের লাগামের দিকে চেয়ে বেদেটা বললে, 'বেল্ট নাকি?'

'তা বেল্টই বটে, যদি ঘোড়া দেখে তোর মনে হয় বেল্ট।'

'তবে ভায়া, বলি তোকে, শালার ঘোড়াটাকে তুই খড় খাইয়ে রেখেছিস বুঝি?'

'খড়?'

এই বলে চেরেভিক ভাবল লাগামে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়াটাকে সে সামনে টেনে এই নির্লজ্জ নিন্দুকের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে, কিন্তু হাতটা তার অস্বাভাবিক লঘুতায় এসে ঠেকল তার থুতনিতে। তাকিয়ে দেখে— লাগামটা কাটা, আর কাটা লাগামের সঙ্গে বাধা আছে— সর্বনাশ! লোম তার খাড়া হয়ে উঠল!— বাঁধা আছে লাল কোর্তার আস্তিনের একটা টুকরো! থুতু ফেলে, ক্রশ করে দুহাত কাঁপিয়ে সে পালাল এই অপ্রত্যাশিত উপহারটির কাছ থেকে, ছোকরা জোয়ানের চেয়েও সে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

১১

আমারই ধন চুরি, আমারই হাতে দড়ি।

প্রবাদ

'ধর! ধর! ধর ওটাকে!' রাস্তার ভিড়াক্রান্ত প্রান্তটায় চেঁচিয়ে উঠল জনকয়েক ছোকরা এবং চেরেভিক টের পেল, হঠাৎ কয়েকটা সবল হাত তাকে জাপটে ধরেছে।

'বাঁধ ওটাকে! এই লোকটাই ভালোমানুষের ঘোড়া চুরি করেছে।'

'ভগবানের দোহাই, বাপু, আমায় তোমরা বাঁধছ কেন গো?'

'আবার জিগ্যেস করছে দ্যাখো! আর তুই কেন বাপু মেলায় আসা চাষি চেরেভিকের ঘোড়াটা চুরি করতে গেলি?'

'তোরা পাগল হলি নাকি ছোঁড়ারা! নিজেই নিজের জিনিস আর কে কবে চুরি করে?'

'ছেঁদো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না হে! অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরেছিলি কেন তবে, একেবারে যেন খোদ শয়তান তোর পেছু নিয়েছে।'

'না ছুটে উপায় কী, যখন শয়তানের জামাটা...'

'খুব হয়েছে জাদুমণি! ও বলে আর যাকে পারো আমাদের ধোঁকা দিতে এসো না। ভুতুড়ে গুজব ছড়িয়ে লোককে ভয় দেখাবার জন্য ছোট হাকিমের কাছে তোর আরো একচোট আছে!'

'ধর! ধর! ধর! ধর ব্যাটাকে!' হাঁক শোনা গেল রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে, 'ওই ব্যাটা, ওই পালাচ্ছে!'

চেরেভিকের চোখে পড়ল তার স্যাঙাত, অতি-শোচনীয় তার অবস্থা, পিছমোড়া করে দুহাত বাঁধা, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা ছোকরা।

'তাজ্জব কাণ্ড সব! বলছিল ছোকরাদের একজন, 'মুখ দেখলেই বোঝা যায় লোকটা চোর, কিন্তু কী বলছিল শুনছিলে? সবাই যখন জিগ্যেস করল অমন পাগলার মতো ছুটছিল কেন, বলে নস্যি নেবার জন্য নাকি পকেটে হাত দিয়েছিল, আর নস্যির কৌটোর বদলে নাকি টেনে বার করে একটুকরো শয়তানের জামা, তা থেকে নাকি আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটাও তাই দেখে ভোঁভোঁ দৌড়।'

'বটে, বটে! এ ওই একই ডেরার ঘুঘু। দুটোকেই বাঁধো একসঙ্গে!'

১২

'কী করেছি বলো সুজন, কীবা অপরাধ,
কটুবাক্য কেন মোরে?' বললে বেচারি,
'কীসের তরে অমন করে ঠাট্টাটিটকারি?
কীসের তরে কীসের তরে', বলতে বলতে সে
তিক্ত নয়ন জলধারে ভাসিয়ে দিলে যে।

আর্তেমভস্কি-গুলাক, 'জমিদারবাবু ও কুকুর'

একটা খোড়ো চালার নিচে স্যাঙাতের সঙ্গে একত্রেই হাত-পা বাঁধা হয়ে শুয়েছিল চেরেভিক। জিগ্যেস করল, 'বাস্তবিকই তুই হয়তো একটা কিছু মেরেছিস স্যাঙাত, নয়?'

'তুইও তাই বলছিস স্যাঙাত! কোথাও যদি কোনোদিন আমি কিছু চুরি করে থাকি তো আমার হাত-পা খসে পড়বে, অবিশ্যি মায়ের কাছে থেকে ছানার পিঠে আর টক ক্রিম চুরি ছাড়া, তা-ও বছর দশেক বয়সে।'

'আমাদের এমন বিপদ কেন বল্ তো, স্যাঙাত? তোর অবিশ্যি তেমন কিছু নয়, তোকে বড়জোর বলবে যে তুই অন্যের জিনিস মেরেছিস। আর আমার এই পোড়াকপালে কী দুর্নাম দ্যাখ দেখি : আমি নিজেই নাকি আমার নিজের

ঘোড়া চুরি করেছি। বোঝাই যাচ্ছে স্যাঙাত জন্ম থেকেই কপালে আমাদের সুখ লেখা নেই।'

'অনাথ অভাগা আমরা হায় গো, কী হল আমাদের!'

এই বলে দুই স্যাঙাত ফোঁপাতে লাগল।

'কী ব্যাপার সলোপি?' এই সময় এসে জিগ্যেস করল গ্রিৎস্কো, 'তোমায় বাঁধল কে?'

'গলোপুপেঙ্কো নাকি, ওই গলোপুপেঙ্কো!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সলোপি, 'আরে এই ছেলেটির সম্পর্কেই তোমায় বলছিলাম স্যাঙাত, বাহাদুর বটে! যদি মিছে বলি তো আমার মাথায় বজ্রপাত হবে— তোর মাথার চেয়ে কম নয় এমন এক ভাঁড় মদ ও আমার সামনে চোঁচোঁ মেরে দিল, মুখ একটু কোঁচকালও না।'

'আর তুই কী, স্যাঙাত, অমন বাহাদুর ছোকরা, আর তাকে তুই মান্যি করলি না?'

'কী আর বলি, দেখতেই পাচ্ছিস', গ্রিৎস্কোর দিকে ফিরে বলল চেরেভিক, 'ভগবান শাস্তি দিয়েছেন তোর কাছে অপরাধ করেছি বলে। ভালোমানুষ তুই, মাপ করে দে ভাইটি। মাইরি বলছি, তোর জন্য সবকিছু করতে রাজি... তবে কী বলবি বল্! গিন্নির মাথায় যে ভূত চেপে আছে!'

'তা আমি অমন রাগ পুষে রাখা লোক নই। যদি চাও তো আমি তোমায় খালাস করে দিতে পারি।'

এই বলে সে ছোকরাগুলোর দিকে চোখ ইশারা করল এবং যারা পাহারা দিচ্ছিল তারাই ছুটে এল বাঁধন খুলতে। 'তার বদলে তুমি তোমার উচিত কর্তব্য করো : বিয়েটা লাগাও গো! এমন মাতন মাতা চাই, যেন গোপাক নাচের পা-ব্যথা সারা বছরেও না যায়।'

'বাহবা, কী বাহবা!' হাততালি দিয়ে বলে উঠল সলোপি, 'মনটা আমার এমন ফুর্তি লাগছে যে মনে হচ্ছে যেন আমার গিন্নিটিকে লুটে নিয়ে গেছে মস্কালরা। সত্যি, ভেবে আর কী হবে : যে যা বলে বলুক, আজই লাগাও বিয়ে। হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!'

'মনে রেখো কিন্তু সলোপি, ঘণ্টাখানেক বাদে আমি তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হব। সেখানে তোমার মাদী ঘোড়াটি আর গম কেনার জন্য লোক জুটেছে দ্যাখো গে।'

'সে কী! পাওয়া গেছে ঘোড়াটা?'

'হাঁ, পাওয়া গেছে!'

আনন্দে চেরেভিকের আর নড়নচড়ন নেই, গ্রিৎস্কোর গমনপথের দিকে সে চেয়ে রইল অপলকে।

'কী গ্রিৎসকো, কাজটা খারাপ উৎরোয়নি বলো?' হন্তদন্ত ছেলেটিকে বলল সেই লম্বা বেদেটা, 'বলদজোড়া এবার আমার তো?'

'তোর! তোর!'

১৩

ভয় কীসের লো, ভয়ে ভীত,
পায়ে দে সোনার জুতো,
দলে যা শত্রু দলে
পায়ের তলে;
যেন তোর জুতোর নালে
ঝমঝমায়!
যেন তোর শত্তুরে সব
চুপ করে যায়!

বিয়ের গান

হাতের উপর তার সুন্দর থুতনিটি রেখে একা একা ঘরে বসে ভাবছিল পারাস্কা। তার হালকা বাদামি মাথাটির চারপাশে নানা স্বপ্নের মেলা। থেকে থেকে হঠাৎ একটা হালকা হাসি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার রক্তিম ঠোঁট, কী একটা আনন্দের অনুভূতিতে উঁচু হয়ে উঠছিল তার কালো ভুরু। তারপর ফের একটা ভাবনার মেঘ নেমে আসছিল তার উজ্জ্বল বাদামি চোখের ওপর।

'কিন্তু ও যা বলেছে তা যদি না হয়?' কী একটা আশঙ্কার ভাব করে গুঞ্জন করল ও, 'যদি আমায় সম্প্রদান না করে, যদি ... না না, তা হবে না! আমার সৎমার যা খুশি হয় সবই করে। আর আমার যা খুশি, তা আমি করতে পারব না? একগুঁয়েমি আমারও বেশ আছে। কী সুন্দর ও! কী অপরূপ হয়ে জ্বলজ্বল করে তার কালো চোখ! কী আদর করে ও ডাকে, পারাসিয়া নয়নমণি আমার! কী সুন্দরই মানায় তার সাদা চাপকানটা। কোমরবন্ধটা আর একটু ঝকঝকে হলে কী ভালোই হত!... নতুন ঘরে বাসা পাতলেই একটা নতুন বুনে দেব, সত্যি। ভাবতেই আনন্দ হয় যে,' মেলায় সে যে লাল কাগজ আঁটা ছোট্ট একটি আয়না কিনেছিল সেটি সে বুকের মধ্য থেকে বার করে গোপন তৃপ্তিতে দেখতে দেখতে বলল, 'ভবিষ্যতে কখনো যদি আমার সৎমায়ের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়, প্রাণ গেলেও কখনো তাকে নমস্কার করব না, বুক ফেটে মরুক গে। না গো সৎমা, সৎমেয়েটিকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ! বরং বালির মুঠো পাথর হবে, ওকগাছ হোগলার মতো নুয়ে পড়বে কিন্তু তোমার সামনে মাথা আমার নুইবে না! ও হ্যাঁ, ভালো কথা মনে হল ... দেখি একবার সধবা মেয়ের টুপি পরে মানায় কেমন, নয় সৎমার টুপিটাই পরি!'

আয়নাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগল, এই বুঝি পড়ে যাবে, চোখে তার ভেসে উঠল মেঝের বদলে হাঁড়িকলসির তাক আর কড়িকাঠের উপর পাতা তক্তাটার ছবি, যেখান থেকে উল্টে পড়েছিল পাদরিপুত্র।

'দ্যাখো দিকি, ঠিক যেন বাচ্চার মতো', হেসে বলল সে, 'পা ফেলছি ভয়ে ভয়ে!'

এই বলে ঠুকঠুক করে পা ফেলতে লাগল সে, ক্রমেই জোর বাড়ল তার; শেষপর্যন্ত বাঁ হাতটা কোমরে রেখে নাচতে শুরু করে দিল, ডান হাতে আয়নাটা, জুতোর হিলে ঠকাঠক শব্দ তুলে গাইতে লাগল তার প্রিয় গানটি :

সবুজ গো তুই বনলতা
যা বিছিয়ে নিচেতে।
তুই গো আমার কাজল ভুরু
আয় গো সরে কাছেতে!

সবুজ ও গো বনের লতা
আরো নিচুতে যা বিছিয়ে!
প্রিয়তম গো, কাজল ভুরু
আয় সরে গো, আরো কাছিয়ে!

এই সময় দরজায় উঁকি দিল চেরেভিক, আয়নার সামনে মেয়েকে নাচতে দেখে থেমে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, হাসল মেয়ের অদ্ভুত খেয়ালে, মেয়ে অবশ্য নিজের মধ্যেই যেন তন্ময় হয়ে কিছুই লক্ষ করছিল না। কিন্তু গানের সুপরিচিত ঝঙ্কার কানে আসতেই চেরেভিকের বুকের মধ্যে দুলে উঠল, কোমরে হাত দিয়ে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সে, নাচতে শুরু করে দিল নিজের সব কাজ ভুলে। স্যাঙাতের উচ্চহাসিতে দুজনেই চমকে উঠল।

'শাবাশ, বাপে-মেয়েতে দিব্যি বিয়ের ধুম লাগিয়ে দিয়েছে দেখছি! শিগগির করে চলো, বর এসেছে!'

এই শেষ কথাটায় পারাসকা তার মাথায় বাঁধা লাল ফিতেটার চেয়েও রাঙা হয়ে উঠল আর তার নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত পিতাঠাকুরের স্মরণ হল কী কারণে বর আসা সম্ভব।

ভয়ে ভয়ে চারিদিক তাকিয়ে টাকিয়ে সে বলল, 'তবে আর কী, চল্ বেটি তাড়াতাড়ি, ঘোড়া বিক্রি হয়েছে এই খুশিতে হিভ্রিয়া ছুটে গেছে যত কাপড়চোপড় কিনতে, তাই ও ফেরার আগেই সব সেরে ফেলতে হবে!'

বাড়ির চৌকাট পেরোতে-না-পেরোতেই পারাসকা টের পেল সে সেই সাদা চাপকান পরা ছেলেটির বাহুবন্ধা হয়েছে, একদল লোকের সঙ্গে রাস্তায় অপেক্ষা করছিল সে।

'ভগবান আশীর্বাদ করুন!' ওদের হাতে হাতে মিলিয়ে দিয়ে বলল চেরেভিক, 'ফুলের মালার মতো গাঁথা হয়ে থাকো দুটিতে!'

এই সময় লোকজনের মধ্যে একটা গোলমাল শোনা গেল।

'বরং বুক ফেটে মরব, তবু এটি হতে দেব না!' শোনা গেল সলোপির সহধর্মিণীর গলা, উচ্চহাস্যে ভিড়ের লোকেরা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল তাকে।

'চটিস না বউ, চটিস না!' ষণ্ডাগণ্ডা দুই বেদে তার হাত চেপে ধরে আছে দেখে নির্ভীক কণ্ঠে বললে চেরেভিক, 'যা হবার হয়ে গেছে, কথার খেলাপ আমি ভালোবাসি না গো!'

'কিছুতেই না, এ হতে পারে না, এ চলবে না!' হিব্রিয়া চেঁচাল বটে, তবে কেউ তার কথা শুনছিল না। নবদম্পতির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল আরো কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে, গড়ে তুলল দুর্ভেদ্য এক নৃত্যের প্রাচীর।

মোটা খাদির কোর্তা পরা লম্বা লম্বা পাকানো মোচঅলা বাজনদারের ছড়ের একটি আঘাতেই সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কীভাবে এক হয়ে উঠতে পারে, সঙ্গতিতে মিলে যেতে পারে, সেটা দেখলে অদ্ভুত অবর্ণনীয় এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন না হয়ে কেউ পারে না। যেসব লোকের গোমড়া মুখ দেখে মনে হয় সারাজীবনেও সেখানে হাসি ফোটেনি, তারা সবাই পা ফেলতে লাগল দুমদাম, কাঁধ নাচাতে লাগল। সবাই ঘুরছে, সবাই নাচছে। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত, অবোধ্য এক অনুভূতি জেগে ওঠে বুকের গহিনে যখন দেখা যায় জরাজীর্ণ মুখের ওপর সমাধির উদাসীনতা এমন সব বৃদ্ধারাও এসে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে নতুন, হাস্যময়, জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যে। উদ্বেগ নেই, তারুণ্যের আনন্দটুকুও নেই, নেই মহানুভবের ঝলক, শুধু নেশার তাড়নাতেই তারা যান্ত্রিকের নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো কিছু মানবসুলভ অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে, মাতাল মাথাগুলো দোলাচ্ছে ধীরে ধীরে, নেচে চলেছে আনন্দমত্ত লোকগুলোর পেছু পেছু, নবদম্পতির দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করছে না।

শোরগোল, হাসাহাসি, গান স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। সুর মরে গেল, অস্পষ্ট ঝঙ্কার তার ম্লান হয়ে হারিয়ে গেল শূন্যে। কোথাও যেন তখনো শোনা যাচ্ছিল নৃত্য পদপাতের ধ্বনি, দূর এক সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনির মতো, তারপর অচিরেই সবকিছু হয়ে উঠল নির্জন নিস্তব্ধ।

ঠিক এমনি করেই কি মিলিয়ে যায় না আমাদের আনন্দ, আমাদের সুন্দর, চঞ্চল অতিথিটি, একক একটি ঝঙ্কার বৃথাই হর্ষ ফোটাতে চায়? নিজের প্রতিধ্বনিতেই তা শোনে এক বিষাদ ও শূন্যতার মিড়, নিজেই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। উদ্দাম উত্তাল তারুণ্যের নানা সঙ্গীরা কি এইভাবেই দুনিয়ায় একের পর এক নির্জনে হারিয়ে যায় না, একাকী পড়ে তাকে শুধু তাদের এক বৃদ্ধ ভাই! বিস্বাদ তার জীবন, যে পড়ে রইল! বুক তার হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত বিষণ্ন, উপায় তার কিছু নেই।

তুর্গেনেভ ইভান সের্গেয়েভিচ (১৮১৮-১৮৮৩)— অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ সাহিত্যিক, ছয়টি বৃহৎ উপন্যাস ও বহু কাহিনী ও গল্পের লেখক। 'দুই গায়ক' (১৮৪৭) কাহিনীটি আছে তাঁর 'শিকারির রোজনামচায়'— সাধারণ রুশ জনগণকে নিয়ে তুর্গেনেভের এই গল্পাবলি প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে।

ইভান তুর্গেনেভ
দুই গায়ক

কলতোভ্‌কা নামের ছোট গ্রামটা একসময় যে জমিদারনির সম্পত্তি ছিল, তাঁর চঞ্চল বেপরোয়া স্বভাবের জন্য ডাকনাম জুটেছিল 'ছটফটে' (আসল নামটা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে), এখন এটা পিটার্সবুর্গের কোনো একজন জার্মানের সম্পত্তি। জায়গাটা ন্যাড়া পাহাড়ের ঢালুতে। পাহাড়টা এক ভয়ঙ্কর খাদে আগাগোড়া দ্বিখণ্ডিত। বিদীর্ণ ও বিক্ষত খাদটার অতল হাঁ-টা গ্রামের রাস্তার ঠিক মধ্যখান হয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে আর নদীর চেয়েও ভালোভাবে সেটা দুভাগ করে রেখেছে হতভাগ্য গ্রামটিকে, নদী তো তবু সেতু বেঁধে পার হওয়া যায়। কয়েকটা কৃশ উইলো গাছ খাদের বালু ঢালুতে ভয়ে ভয়ে গজিয়ে উঠেছে, আর খাদের একেবারে তলায় যে জায়গাটা শুকনো আর তামার মতো হলদে সেখানে প্রকাণ্ড মেটে রঙের পাথরের চাঙর। অবস্থাটা যে খুব নিরানন্দকর, না মেনে উপায় নেই; তবু চারপাশের লোকেরা কলতোভ্‌কার রাস্তা ভালোভাবেই জানে, প্রায়ই যায় সেখানে, আর যায় বেশ আগ্রহ করেই।

খাদের শীর্ষে, যেখানে সরু ফাটল দিয়ে খাদটা আরম্ভ হয়েছে, সেখান থেকে খানিকটা দূরে একটা অনতিবৃহৎ চতুষ্কোণ কুঁড়েঘর। অন্য ঘরগুলো থেকে এটা আলাদা, একলা। চালাটা খড়ের, একটা চিমনিও আছে। একটা জানালা খাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে, শীতের সন্ধ্যায় যখন আলো জ্বেলে দেওয়া হয় তখন বহুদূর থেকে তুহিন কুয়াশার মধ্যেও জানালাটা দেখতে পাওয়া যায়, আর এই মিটমিটে আলো বহু চাষাকে পথের হদিশ দেয় ধ্রুবতারার মতো। একটা নীল বোর্ড দরজার উপরে লটকানো, কুঁড়েটা একটা ভাঁটিখানা, নাম 'স্বাগতম কুঞ্জ।' মদের দাম অন্যান্য জায়গার চেয়ে এখানে সম্ভবত সস্তা নয়, কিন্তু আশপাশের ও ধরনের দোকানের চেয়ে এখানে ভিড় বেশি। তার কারণ ভাঁটিখানাটির মালিক নিকোলাই ইভানিচ।

নিকোলাই ইভানিচ এককালে ছিল পাতলা ছিপছিপে তরুণ, গোলাপি গাল আর কোঁকড়া চুল; কিন্তু এখন সে অত্যন্ত মোটা, চুলগুলো পাকা, চর্বিতে মুখখানা গোল হয়ে গেছে, চোখদুটোতে চাতুর্য আর ভালোমানুষির ভাব, মোটা কপালটা জুড়ে সুতোর মতো বলিরেখা— কলতোভ্‌কায় সে কুড়ি বছরেরও ওপর বাস করছে।

অধিকাংশ ভাঁটিখানার মালিকদের মতোই নিকোলাই ইভানিচ চটপটে চতুর লোক। খুব কিছু একটা আপ্যায়ন বা আলাপের আশ্রয় না নিয়েও খদ্দেরকে আকর্ষণ করার বা ধরে রাখার গুণ তার আছে, মেদমন্থর মালিকের সতর্ক অথচ ধীর অমায়িক দৃষ্টির নিচে তারা বিশেষ খুশি হয় তার ভাঁটিখানায় এসে বসতে। তার সহজবুদ্ধি যথেষ্ট; জমিদার, চাষি, মধ্যবিত্তদের জীবনের অবস্থা তার সম্পূর্ণ জানা। কঠিন সমস্যাতেও সে বুদ্ধিমানের মতো পরামর্শ দিতে পারে, তবু সতর্ক ও স্বার্থপর লোকদের মতো তফাতে থাকাই তার পছন্দ; খুব বেশি হলে তার খদ্দেরদের, তা-ও আবার প্রিয় খদ্দেরদের সে পথ দেখায় নিতান্তই দূর থেকে, নেহাত যেন না ভেবেচিন্তে বলা দু-একটা আভাস ইঙ্গিত দিয়ে। রুশদের কাছে যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ এমন সব বিষয়ে যেমন ঘোড়া-গরুমোষ, কাঠ, ইট, বাসনকোসন, পশমি কাপড়, চামড়া, গান-নাচ— এইসব বিষয়েই সে সর্বজ্ঞ। যখন কোনো খদ্দের থাকে না, তখন সে সাধারণত সরু সরু পাদুটো মুড়ে, নিজের বাড়ির দোরের সামনে জমির উপর বস্তার মতো বসে থাকে, বাড়ির সামনে দিয়ে যত লোক যায় তাদের সকলের সঙ্গেই সৌজন্য বিনিময় করে। নিজের জীবনে সে যথেষ্ট কিছু দেখেছে, আজ যারা নেই এমন কয়েক কুড়ি খুদে জমিদার তার দোকানে 'টানতে' এসেছে, অন্তর্ধান করেছে, একশো মাইলের মধ্যে যা ঘটে সে সমস্ত তার নখদর্পণে, কিন্তু কখনো তা নিয়ে গল্পগুজব করে না। সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণদৃষ্টি দারোগার চোখ যা এড়িয়ে গেছে সে ব্যাপারও যে তার জানা এমন কোনো ইঙ্গিতও সে দেয় না। সবকিছু সে নিজের মনে চেপে রাখে, হাসে আর ঠুনঠান করে গেলাশ সরায়। প্রতিবেশীরা তাকে শ্রদ্ধা করে; জেনারেল শ্চেরেপেতেঙ্কো, ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় কর্তা, তার ছোটবাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় অনুগ্রহসূচক মাথা নেড়ে যান।

নিকোলাই ইভানিচ বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক। কুখ্যাত এক ঘোড়াচোরকে তার এক বন্ধুর আস্তাবল থেকে চুরি করা ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে সে বাধ্য করেছিল। পাশের গ্রামের চাষিরা যখন নতুন এক নায়েবকে মানতে গররাজি হয় তখন সে তাদের প্রকৃতিস্থ করতে পেরেছিল, এইরকম আরো অনেক কাহিনী আছে। এর থেকে এমন কল্পনা করা উচিত নয় যে ন্যায়বিচারের প্রতি ঝোঁকের জন্য কিংবা প্রতিবেশীদের প্রতি অনুরক্তিবশত এসব কাজ সে করে— না, নিতান্তই তার আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে বিপত্তি ঘটাবার মতো কোনো ঘটনা যাতে না হয় সেইটুকুই তার লক্ষ্য।

নিকোলাই ইভানিচ বিবাহিত, সন্তানাদিও আছে। স্ত্রীটি তীক্ষ্ণনাসা ও চঞ্চল চোখের চটপটে শহুরে মেয়ে, সম্প্রতি স্বামীর মতো একটু মোটা হয়েছে। সব বিষয়েই স্বামী তার ওপর নির্ভর করে, টাকাপয়সার চাবি থাকে তারই কাছে। হট্টগোলে মাতালরা তাকে ভয় করে, এদের সে পছন্দ করে না; তাদের কাছ থেকে লাভ হয় কম আর গণ্ডগোল বেশি; স্বল্পভাষী, গোমড়ামুখোদেরই সে পছন্দ করে বেশি। নিকোলাই ইভানিচের ছেলেপিলেরা এখনো ছোট, প্রথম সন্তানক'টি মারা গেছে, কিন্তু যে-ক'টি জীবিত আছে তারা দেখতে বাপ-মার মতো, তাদের বুদ্ধিদীপ্ত স্বাস্থ্যবান মুখচোখ দেখলে মন খুশিতে ভরে ওঠে।

একদিন জুলাই মাসের অসহ্য গরমের সময়ে আমি পা টেনে টেনে কুকুরটাকে নিয়ে কলতোভ্‌কার খাদের ধার দিয়ে স্বাগতম কুঞ্জের দিকে যাচ্ছিলাম। আকাশে সূর্যের ভীষণ অগ্নিবর্ষণ চলেছে, অবিরাম ভাপ উঠছে, দগ্ধ হচ্ছে সবকিছু। দম বন্ধ করা ধুলোয় বাতাস ভারী। চকচকে কাক আর দাঁড়কাকগুলো ঠোঁট ফাঁক করে পথিকদের কাছে নালিশ জানিয়ে যেন সহানুভূতি চাইছে। শুধু চড়ুইগুলোই অবসন্ন হয়নি; পালক ফুলিয়ে, বেড়ার উপর বসে আগের চেয়েও প্রবলভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কিচমিচ করছে, কিংবা দল বেঁধে ধুলোভর্তি রাস্তা থেকে উড়ে গিয়ে সবুজ শণক্ষেতের উপর ধূসর মেঘের মতো ঘুরে ঘুরে উড়ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথাও জল ছিল না, স্তেপের অন্যান্য বহু গ্রামের মতো কলতোভ্‌কাতেও কোনো ঝরনা কিংবা কুয়ো না থাকায় লোকে পুকুর থেকে একরকম তরল কাদাই পান করে ... কেউ ওই ন্যক্কারজনক পানীয়কে জল বলবে না। ভেবেছিলাম নিকোলাই ইভানিচের ওখানে এক গেলাশ বিয়ার কিম্বা ক্‌ভাস চাইব।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বছরের কোনো সময়েই কলতোভ্‌কার দৃশ্য খুব আনন্দদায়ক হয় না; কিন্তু খুবই বিচ্ছিরি লাগে যখন জুলাইয়ের প্রচণ্ড সূর্য নির্মমভাবে অগ্নিবর্ষণ করে বাড়িগুলোর বাদামি রঙের গড়ানো ছাদে, আর এই গভীর খাদে, ধুলোভর্তি শুকনো চারণভূমিতে, যেখানে লম্বাঠেঙে রোগাটে মুরগিগুলো হতাশ হয়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে, এবং পুরনো জমিদারবাড়ির ভগ্নাংশের উপর— এখন সে জায়গাটা একটা আস্পেন কাঠের ফাঁপা ধূসর কাঠামো, জানালার বদলে শুধু গর্ত, চারিদিকে বিছুটিলতা, বড় বড় ঘাস আর সোমরাজ গজিয়েছে; পুকুরটার জলের রঙ কালো, মনে হয় যেন পুড়ে গেছে আর সমস্তটা হাঁসের পালকে ভর্তি, পুকুরটার পাড় আধ-শুকনো কাদায় ভর্তি, আর এর ভাঙা বাঁধটার কাছে ছাইরঙা, অল্প অল্প পায়ের ছাপ পড়া পাঁকের উপর গরমে বিষণ্ন ভেড়াগুলো ঘেঁসাঘেঁসি করে শুয়ে শুয়ে হাঁপায় আর হাঁচে, বিরস ধৈর্যে নুইয়ে দেয় তাদের মাথাগুলো, যেন অপেক্ষা করছে এই অসহ্য গরম কবে শেষ হবে। ক্লান্ত পায়ে আমি নিকোলাই ইভানিচের বাড়ির কাছে এসে পড়লাম, গাঁয়ের

ছেলেপিলেদের মধ্যে স্বাভাবিক বিস্ময় জাগল যা পরিণত হল একটা অর্থহীন নিষ্পলক চাউনিতে, আর কুকুরগুলোর মধ্যে জাগল রাগ, যার প্রকাশ হল এমন ক্ষিপ্ত কর্কশ চিৎকারে যে মনে হল তাদের অন্ত্রগুলো সব ছিঁড়ে গিয়েছে— নিজেরাই তারা পরে হাঁপাতে আর কাশতে লাগল।

হঠাৎ ভাঁটিখানার দরজায় লম্বাঝুল পশমের কোট পরে একজন লম্বামতো চাষা দেখা দিল; তার মাথাটা খালি, কোমর ঘিরে একটা নীল রুমাল বেল্টের মতো বাঁধা। দেখতে অনেকটা গৃহদাসের মতো; শুকনো, কুঁচকে যাওয়া মুখ, মাথায় ঘন পাকা উস্কখুস্ক চুল। তাড়াতাড়ি সে কাকে যেন হাত নেড়ে ডাকছিল, হাতটা অবশ্য তার ইচ্ছের চেয়ে অনেকটা বেশিই এগিয়ে যাচ্ছিল, বোঝা গেল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট টেনেছে।

অতিকষ্টে লোমশ ভুরুদুটো তুলে সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আরে, এসো এসো! এসো, চলে এসো মিটমিটে! এহ, ভায়া একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছ যে, মাইরি বলছি! ভালো হচ্ছে না ভাই। সকলে তোমার জন্য বসে আছে আর তুমি আসছ দেখ হামাগুড়ি দিয়ে ... চলে এসো।'

কর্কশ গলায় উত্তর এল, 'আসছি, আসছি!' আর একটা কুঁড়েঘরের পেছন থেকে একটা বেঁটে মোটা খোঁড়া লোককে দেখা গেল। খাদির একটা বেশ পরিষ্কার কোট আধ-খোলা করে পরা; একটা লম্বা ছুঁচলো টুপি ঠিক ভুরুর উপরে, যার ফলে তার স্থূল গোলগাল মুখটা সেয়ানা আর ফাজিল ফাজিল দেখাচ্ছে। ছোট ছোট হলদে চোখদুটো কেবলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে, পাতলা ঠোঁটে একটা চেষ্টাকৃত সংযত হাসি সবসময় লেগেই আছে, তীক্ষ্ণ লম্বা নাকটা সামনের দিকে হালের মতো উদ্ধতভাবে বেরিয়ে। 'আসছি ভাই।' সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভাঁটিখানার দিকে এগোতে লাগল, 'ডাকছ কেন?... কে বসে আছে আমার জন্য?'

'কেন ডাকছি?' লম্বাঝুল পশমের কোট পরা লোকটা ভর্ৎসনার সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, 'তুমি ভায়া একটি আজব চিজ মিটমিটে; আমরা তোমায় ডাকছি ভাঁটিখানায় আর তুমি জিগ্যেস করছ, কেন? সব ভালো লোকের পো'রা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে : তুর্কি ইয়াকভ, বুনো বাবু আর ঝিজদ্রার ঠিকাদার। ঠিকাদারের সঙ্গে ইয়াকভ বাজি ধরেছে, বাজি হচ্ছে এক জালা বিয়ার— যে হারাতে পারবে, মানে ভালো গাইতে পারবে, মানে ... বুঝতে পেরেছ?'

মিটমিটে বলে যাকে ডাকা হচ্ছিল সে লোকটা সাগ্রহে বলল, 'ইয়াকভ গাইছে নাকি? বাজে কথা বলছ না তো খ্যাপা?'

খ্যাপা বেশ মর্যাদার সঙ্গে জবাব দিল, 'আমি বাজে কথা বলছি না, বাজে কথা বলছ তুমিই। বাজি যখন ধরা হয়েছে তখন সে গাইবেই, বুঝলে মানিক, হাঁদারাম, মিটমিটে!'

মিটমিটে প্রত্যুত্তর দিল, 'চল্ গাধা, চল্!'

হাতদুটো বাড়িয়ে জড়িত স্বরে খ্যাপা বলল, 'তবে একটা চুমু দাও, সোনার চাঁদ।'

মিটমিটে তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ঘৃণাভরে বলল, 'ভাগ, কেবলচন্দর!' তারপর দুজনেই গুড়ি মেরে নিচু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

এই বাক্যালাপ শুনে আমার কৌতূহল খুব বেড়ে গেল। অনেকবার আমি লোকমুখে শুনেছি তুর্কি ইয়াকভ ও অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা গাইয়ে, এখানে আর-একজন ওস্তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওর গান শোনার সৌভাগ্য উপস্থিত। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলাম।

কোনো গ্রাম্য ভাঁটিখানা ভালো করে দেখা সম্ভবত খুব কম পাঠকেরই হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমরা শিকারি, গতায়াত আমাদের নেই কোথায়? খুব সহজভাবেই সেগুলো তৈরি। সাধারণত বাইরের দিকে একটা অন্ধকার বারান্দা আর ভেতরের দিকে চিমনিঅলা একটা ঘর, ঘরটা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা, পেছনের দিকে কোনো খদ্দেরের যাওয়ার অধিকার নেই। পার্টিশনের গায়ে চওড়া ওক কাঠের টেবিলের উপরে বড় করে জানালা কাটা। টেবিলটার উপরে মদ পরিবেশন করা হয়। জানালার ঠিক উল্টোদিকে তাকের উপর নানান মাপের সিল-করা বোতল দাঁড় করানো। খদ্দের বসবার জন্য ঘরের সামনের দিকটায় বেঞ্চি কতকগুলো, দুটো কি তিনটে খালি পিপে আর কোণের দিকে একটা টেবিল। অধিকাংশ গ্রামের ভাঁটিখানা বেশ অন্ধকার, সেগুলোর কাঠের দেয়ালে ঝলমলে সস্তা ছবিগুলো প্রায় দেখাই যায় না, গ্রামের প্রায় সব কুঁড়েঘরে যে ধরনের ছবি থাকে।

'স্বাগতম কুঞ্জে' যখন গেলাম, তখন লোকজনের মস্ত ভিড় জমে গিয়েছে সেখানে।

ভাঁটিখানার পেছনে নিজের চিরাভ্যস্ত জায়গায় পার্টিশনের গায়ের সেই চওড়া ফাঁকা জায়গাটা জুড়ে একটা ডোরাকাটা ছাপা শার্ট গায়ে দিয়ে নিকোলাই ইভানিচ দাঁড়িয়ে। গোলগাল মুখে অলস হাসি, দুটি স্থূল ফরসা হাতে সে মিটমিটে আর খ্যাপার জন্য দু গ্লাস মদ ঢালছে। তার পেছনে জানালার কাছে এককোণে দেখা যাচ্ছে তার তীক্ষ্ণচক্ষু স্ত্রীকে। ঘরের মাঝখানে, তেইশ বছরের রোগা ছিমছাম চেহারার তুর্কি ইয়াকভ দাঁড়িয়ে। গায়ে নীল রঙের একটা লম্বাঝুল কোর্তা। দেখে চটপটে মজুর বলে মনে হয়, বোঝা যায় স্বাস্থ্যের বড়াই তার নেই। গাল ভাঙা, বড় বড় চঞ্চল ধূসর দুটো চোখ, খাড়া নাক, নাসারন্ধ্র সূক্ষ্ম চঞ্চল, ফরসা ঢালু কপালের উপর হালকা বাদামি কোঁকড়া চুলগুলো উল্টে আঁচড়ানো, ঠোঁটদুটো পুরু হলেও বেশ সুন্দর আর অভিব্যক্তিময়, সারা মুখে আবেগপ্রবণ সংবেদনশীল স্বভাবের ছাপ। সে খুব উত্তেজিত তখন; চোখ পিটপিট করছে, অস্থির শ্বাস ফেলছে, হাত কাঁপছে যেন জ্বর এসেছে, সত্যিই তার জ্বর— উদ্বেগের সেই আকস্মিক জ্বর যা হঠাৎ সভার সামনে বক্তৃতা বা গান করতে বলায় অনেকেই উপলব্ধি করেছে।

বছর চল্লিশের চওড়া চোয়াল আর চওড়া কাঁধঅলা একজন লোক তার কাছে দাঁড়িয়ে, তার কপালটা ছোট, তাতারদের মতো সরু সরু চোখ, ছোট চাপা নাক, চৌকো থুতনি আর চকচকে কালো চুল শুয়োরের কুঁচির মতো কর্কশ। মুখের রঙ শ্যামবর্ণ, তাতে সিসের মতো একধরনের আভা, বিশেষত তার পাণ্ডুর ঠোঁট— সব মিলিয়ে তার মুখের ভাবকে বলা যেত প্রায় হিংস্র যদি না সেই মুখ হত অমন শান্ত তন্ময়। প্রায় এতটুকুও নড়ছে না সে, শুধু কাঁধে জোয়াল চাপানো ষাঁড়ের মতো ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক চাইছে। পরনে কী একটা লম্বা ওভারকোট, খুব নতুন নয় সেটা, তাতে লাগানো মসৃণ পেতলের বোতাম, একটা পুরনো কালো সিলকের রুমাল তার সুপুষ্ট ঘাড়ে পাট করে বাঁধা। সবাই তাকে বলে বুনো বাবু।

ঠিক তার মুখোমুখি, সন্তদের পুণ্য মূর্তির নিচে একটা বেঞ্চিতে ইয়াকভের প্রতিদ্বন্দ্বী ঝিজদ্রার ঠিকাদার বসে। বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট বছর তিরিশের লোকটা, মুখে বসন্তের দাগ, চুলগুলো কোঁকড়া, ভোঁতা ওলটানো নাক, সজীব বাদামি দুটো চোখ, অল্প অল্প দাড়ি। চারপাশে সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে চাইছে, দুটো হাতের উপর টেবিলে ভর দিয়ে নিশ্চিন্তে পা দোলাচ্ছে আর তাল ঠুকছে। পায়ে রঙিন বর্ডার দেওয়া শৌখিন একজোড়া বুট। পরনে মখমল কলার লাগানো হালকা ধূসর রঙের একটা নতুন, মিহি কোটের তল থেকে জ্বলজ্বল করে চোখে পড়ে গলার চারপাশে পরিপাটি করে বোতাম লাগানো একটা লাল কামিজের প্রান্ত।

উল্টোদিকে দরজার ডানপাশে টেবিলের পেছনে বসে আছে একটা চাষি, পরনে সরু বহুব্যবহৃত কোর্তা, ঘাড়ের কাছটা বেশ ছেঁড়া। সূর্যের সরু হলদে রশ্মিদুটো ছোট জানালার ধূলিধূসর শার্শি দিয়ে ঢুকছিল, মনে হচ্ছিল ঘরের অভ্যস্ত অন্ধকারের সঙ্গে যেন ব্যর্থ লড়াই করে চলেছে। ঘরের সবকিছু সে আলোয় মৃদু, ঠিক যেন ছোপ লেগে লেগে আলোকিত হয়ে উঠেছে। তবে ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা, চৌকাট পেরোতেই দম বন্ধ করা গ্রীষ্মের তাপ একটা ভারি বোঝার মতো আমার দেহ থেকে নেমে গেল।

দেখতে পেলাম নিকোলাই ইভানিচের খদ্দেররা প্রথমে সবাই আমার আগমনে একটু যেন বিচলিত হয়ে পড়ল; কিন্তু যেই তারা দেখল যে সে আমায় বন্ধুর মতো মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানাল তখন আশ্বস্ত হয়ে আমার দিকে আর কোনো মনোযোগ দিল না। আমি খানিকটা বিয়ার নিয়ে সেই ছেঁড়া কোর্তা পরা চাষিটার কাছে এককোণে বসে পড়লাম।

হঠাৎ এক গেলাশ মদ এক চুমুকে খেয়ে ফেলে, কথার সঙ্গে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে— বোঝাই যায় হাত না নেড়ে সে একটাও কথা বলতে পারে না— খ্যাপা বলে উঠল, 'বসে থেকে লাভ কী? শুরু হবে তো হয়ে যাক। কী বলো ইয়াকভ?

নিকোলাই ইভানিচ তার সঙ্গে সায় দিয়ে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, 'শুরু হোক, শুরু হয়ে যাক।'

ঠিকাদার আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে শান্তভাবে বলল, 'বেশ শুরু হোক; আমি তৈরি।'

উত্তেজিত সুরে ইয়াকভ বলল, 'আমিও তৈরি।'

মিটমিটে কিঁচকিঁচিয়ে বলে উঠল, 'শুরু করো হে।'

কিন্তু সকলের ঐক্যবদ্ধ মিলিত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ শুরু করল না; ঠিকাদার এমনকি বেঞ্চি থেকেও উঠল না— আরো কিছুর জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল তারা।

হঠাৎ বুনো বাবু গম্ভীর তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'শুরু করো!' ইয়াকভ চমকে উঠল। ঠিকাদার বেল্টটা টেনে নামিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

গলার স্বর একটু বদলে সে বুনো বাবুকে জিগ্যেস করল, 'কিন্তু প্রথমে কে শুরু করবে?'

বুনো বাবু বলিষ্ঠ পাদুটো ফাঁক করে কনুই পর্যন্ত হাতদুটো ব্রিচেসের পকেটে ঢুকিয়ে ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খ্যাপা জড়িত স্বরে বলল, 'তুমি, ঠিকাদার, তুমি, তুমিই শুরু করবে ভাই।'

বুনো বাবু ভুরুদুটো নামিয়ে তার দিকে চাইল।

খ্যাপা মৃদু কী একটা শব্দ করে, থতমতো খেয়ে কড়িকাঠের দিকে চাইল, তারপর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে চুপ করে গেল।

বুনো বাবু বেশ থেমে থেমে উচ্চারণ করল, 'টস হবে।' তারপর বলল, 'টেবিলের উপর পাত্র রাখো।'

নিকোলাই ইভানিচ ঝুঁকে দম নিয়ে বিয়ারের জালাটা মাটি থেকে তুলে টেবিলে রাখল।

বুনো বাবু ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লাগাও!

ইয়াকভ পকেট হাতড়ে একটা আধলা বার করে তাতে দাঁত দিয়ে চিহ্ন দিল। ঠিকাদার তার লম্বাঝুল কোর্তার পকেট থেকে একটা নতুন চামড়ার ব্যাগ বার করে, ধীরেসুস্থে ফিতে খুলে, খুচরো একগাদা পয়সা থেকে নতুন একটা আধলা বেছে নিল। খ্যাপা তার নোংরা টুপিটা বাড়িয়ে ধরল, টুপির সামনের অংশটা ভেঙে গিয়ে ঝুলছে, ইয়াকভ আর ঠিকাদার নিজের নিজের আধলাদুটো তাতে ফেলে দিল।

বুনো বাবু মিটমিটের দিকে ফিরে বলল, 'একটা তোমায় তুলতে হবে।'

মিটমিটে আত্মতৃপ্ত হাসির সঙ্গে দু-হাতে টুপিটা নিয়ে নাড়াতে লাগল।

মুহূর্তের জন্য নেমে এল গভীর স্তব্ধতা; পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আধলাগুলোর মৃদু ঠুনঠুন শব্দ উঠল। চতুর্দিকে ভালো করে তাকালাম : প্রত্যেক মুখেই একটা উত্তেজিত প্রতীক্ষা। বুনো বাবুও উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমার পাশের ছেঁড়া কোর্তা পরা চাষিটা পর্যন্ত উৎসুক হয়ে ঘাড়টা বাড়াল। মিটমিটে টুপির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঠিকাদারের আধলা তুলতে সকলে হাঁপ ছাড়ল। ইয়াকভ লাল হয়ে উঠল, আর ঠিকাদার চুলের উপর দিয়ে হাতটা বুলিয়ে নিল।

খ্যাপা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তো বলেইছিলাম তুমি শুরু করবে, আমি তো আগেই বলেছিলাম।'

বুনো বাবু অবজ্ঞার সঙ্গে মন্তব্য করল, 'হয়েছে, হয়েছে, ক্যাঁক ক্যাঁক করতে হবে না!' ঠিকাদারের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সে বলল, 'শুরু হোক।'

ঠিকাদার একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কী গান গাইব?'

মিটমিটে উত্তর দিল, 'যা খুশি, যা মাথায় আসে গাও!'

নিকোলাই ইভানিচ বুকের উপর হাত গুটিয়ে সুর মিলিয়ে বলল, 'বটেই তো, যা ইচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনো হুকুম নেই। তোমার যা খুশি গাও, তবে ভালো করে গাইবে, পরে আমরা ন্যায্যমতে বিচার করব।'

খ্যাপা তার খালি গেলাশের কানা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে মন্তব্য জুড়ল, 'নিশ্চয় ন্যায্যমতো।'

কোটের কলারটা আঙুল দিয়ে ঠিক করতে করতে ঠিকাদার বলল, 'আগে গলাটা একটু সাফ করে নিই ভায়া।'

'নাও হে, মিছিমিছি দেরি কোরো না, শুরু করো!' এই বলে রায় জানিয়ে বুনো বাবু চোখ নামিয়ে নিল।

ঠিকাদার খানিকটা কী ভেবে নিল, মাথা নাড়ল, তারপর এগিয়ে গেল সামনে। তার ওপরে স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল ইয়াকভের চোখদুটো।

কিন্তু প্রতিযোগিতার বর্ণনা দেওয়ার আগে আমার গল্পের প্রতিটি চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা বোধহয় অবান্তর হবে না। 'স্বাগতম কুঞ্জে' যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের কয়েকজনকে পূর্বেই আমি চিনতাম, অন্যান্যদের খবর আমি সংগ্রহ করেছি পরে।

খ্যাপাকে দিয়েই শুরু করা যাক। লোকটার আসল নাম ইয়েভগ্রাফ ইভানভ; কিন্তু আশেপাশের সবাই তাকে খ্যাপা ছাড়া অন্যকিছু বলে ডাকত না, সে নিজেও তার ডাকনামেই পরিচয় দিত। নামটা তার সঙ্গে এত ভালো খাপ খেয়েছিল যে, বাস্তবিকই তার অর্থহীন, সদাশঙ্কিত স্বভাবের সঙ্গে অন্য কোনো নাম মানাতই না। লোকটা অবিবাহিত, নেশাখোর গৃহদাস, মনিব তাকে বহুদিন আগেই তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন সে বেকার অবস্থায় একটা কোপেকও অর্জন করে না। তবে প্রত্যেক দিনই অন্যের খরচে নেশা করে মাতাল হয়ে যায়। বহু পরিচিত লোক আছে তার যারা তাকে মদ আর চা খাওয়ায়, যদিও কেন খাওয়ায় নিজেরাই তা জানত না। কেননা আড্ডায় আনন্দ দেওয়া তো দূরের কথা, সে তার অর্থহীন বকবকানিতে, তার অসহ্য গায়ে পড়া ভাবে, প্রচণ্ড হাত-পা নাড়ায় আর অবিশ্রাম অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ হাসিতে সকলকেই বিরক্ত করে তুলত। গান গাইতে কিম্বা নাচতে জানত না সে; সারাজীবনে একটিও বুদ্ধি-বিবেচনার কথা সে বলেনি; শুধু বকবক করে সব বিষয়ে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়েছে— একেবারে বাজে বাক্যবাগীশ! কিন্তু চল্লিশ মাইলের মধ্যে একটিও মদের আড্ডা বসেনি যেখানে

তার লম্বা রোগা চেহারা অতিথিদের মধ্যে আবির্ভূত হয়নি; এখন তাই সকলেই তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আর অপরিত্যাজ্য উৎপাতের মতোই তা মেনে নিয়েছে। সকলেই অবশ্য তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, কিন্তু তার নির্বোধ উচ্ছ্বাসকে থামাতে জানে শুধু বুনো বাবু।

মিটমিটের সঙ্গে খ্যাপার একটুও মিল নেই। তার ডাকনামটা মানানসই বটে, কিন্তু অন্য লোকদের চেয়ে বেশি চোখ মিটমিট সে করত না। সকলেই জানে নামকরণে রুশেরা ওস্তাদ। এই লোকটার অতীত সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা সত্ত্বেও তার জীবনের বহু অধ্যায় আমার কাছে আর সম্ভবত আরো অনেকের কাছে থেকে গেছে অজ্ঞাত, সাহিত্যিকদের ভাষায় : অজানার অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমি শুধু জানতে পেরেছি যে সে এক নিঃসন্তানা জমিদারগিন্নির কোচওয়ান ছিল। যে তিনটে ঘোড়ার ভার তার ওপরে ছিল সে কটাকে নিয়ে সে ভেগে যায়, পুরো একবছর কোথায় আত্মগোপন করে, তারপরে নিঃসন্দেহে ভবঘুরে জীবনের অসুবিধে ও দুঃখকষ্টের বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে পঙ্গু হয়ে ফিরে এসে কর্ত্রীর পায়ে পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যে আদর্শ সৎস্বভাবের পরিচয় দিয়ে পূর্বের দোষ খণ্ডাতে সফল হয়, তারপর ভদ্রমহিলার কৃপা লাভ করে, শেষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে জমিদারির গোমস্তা হয়, তারপর কর্ত্রীর মৃত্যুর পরে— কী করে কে জানে— গোলামি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যায়। শুরু করল ব্যবসা, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তরিতরকারির বাগান ভাড়া নিল, এখন টাকা করে বেশ আরামে জীবনযাপন করছে। বেশ অভিজ্ঞ লোক, কত ধানে কত চাল হয় তা তার জানা। লোকটা ভালোও নয়, মন্দও নয়, বরং বলা যায় হিসেবি, সাতঘাটের জল খাওয়া লোক, মানুষকে চেনে, জানে কী করে তাদের দিয়ে নিজের সুবিধে করিয়ে নিতে হয়। সে সাবধানী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগী— ঠিক খেঁকশিয়ালের মতো; বুড়িদের মতো সে গুজবপ্রিয় বটে, তবু নিজের কথা সে কখনো বলত না, বরং অন্যদের পেটের কথাই বার করত। কখনো হাবাগোবার ভান করত না সে, যদিও তার মতো বহু সেয়ানা লোকই ওইরকম ভান করে থাকে; বলতে কী ওইভাবে কারুকে ধাপ্পা দেওয়া তার পক্ষে শক্ত : তার তীক্ষ্ণ চতুর চোখের মতো অত ধারালো চোখ আর আমি দেখিনি। এই চোখদুটো ওপর ওপর দৃষ্টিপাত করেই ক্ষান্ত হত না, মানুষকে বেশ করে খুঁটিয়ে দেখে নিত; আপাতদৃষ্টিতে যেটা বেশ সহজ তেমন একটা ব্যাপার নিয়ে মিটমিটে কখনো কখনো বহু সপ্তাহ ধরে ভাবত, কখনো-বা আবার হঠাৎ মরিয়া হয়ে কোনো ঝুঁকির কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসত, যা দেখে সকলের মনে হত এইবার তার সর্বনাশ হবে ... দেখা যেত কিন্তু দিব্যি কৃতকার্য হয়ে গেছে সে, সবই একেবারে সরগর। ভাগ্য ভালো ছিল তার, কপাল মানত, শুভাশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করত। মোটের ওপর একজন সংস্কারভীরু লোক। কারুর সঙ্গে বিশেষ

সম্বন্ধ রাখত না বলে তাকে কেউ পছন্দ করত না, কিন্তু সমীহ করত। সংসার বলতে একমাত্র ছেলেই তার সব, তাকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত। এরকম বাপের কাছে মানুষ হয়ে সে ছেলে যে জীবনে অনেক এগুবে তাতে সন্দেহ নেই। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে বুড়োরা গল্পগুজব করতে করতে তার সম্বন্ধে এখনই নিচুগলায় বলাবলি করে, 'বাচ্চা মিটমিটে একেবারে বাপকা বেটা।' সকলেই জানে— এ-কথার কী অর্থ; এর পরে আর কিছুই যোগ করার প্রয়োজন হত না।

তুর্কি ইয়াকভ বা ঠিকাদার সম্বন্ধে বেশি কিছু না বললেও চলে। ইয়াকভকে তুর্কি বলা হত কেননা সত্যিই একজন যুদ্ধবন্দি তুর্কি রমণীর গর্ভে তার জন্ম। মনটা তার সত্যিকারের অর্থে শিল্পী, যদিও কাজটা ছিল তার এক ব্যবসায়ীর কাগজ কারখানায়।

ঠিকাদার সম্বন্ধে স্বীকার করতেই হয়, তার জীবনকাহিনী আমার কাছে অজানাই থেকে গেছে। তাকে দেখে এইটুকু মনে হয়েছিল যে লোকটা চটপটে তুখোড় এক শহুরে কারবারি। কিন্তু বুনো বাবু সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার।

তাকে প্রথমে দেখেই কেমন একটা কর্কশ, স্থূল ও অপ্রতিহত শক্তির অনুভূতি হয়। গড়নটা কেমন বদখত, আমরা যাকে বলি 'ঘাড়ে গর্দানে', কিন্তু একটা অক্লান্ত শক্তির উল্লাস তাকে ঘিরে আছে, আর বলতে অদ্ভুত লাগে যে তার ভালুকের মতো চেহারাটাও একটা স্বকীয় ধরনের শ্রী থেকে বঞ্চিত নয়। সেটা হয়তো এসেছে নিজের শক্তিমত্তার ওপর সম্পূর্ণ স্থিরবিশ্বাস থেকেই। প্রথমে বোঝাই যায় না যে এই হার্কিউলিস সমাজের কোন্ শ্রেণির লোক; তাকে দেখে গোলাম মনে হয় না, শহুরে কারবারিও সে নয়, নয় দীন-দরিদ্র ছাঁটাই কেরানি, সর্বস্বান্ত উগ্রচণ্ডা শিকারি খুদে জমিদারও নয়। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেউ জানে না কোত্থেকে সে এসে হাজির হয়েছে আমাদের এই অঞ্চলে। লোকে বলত, সে নাকি খোদকস্ত কোনো এক স্বাধীন একহালি জোতদার বংশের লোক। একসময় কোথাও নাকি সরকারি চাকরি করত, কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু কেউ জানত না। এবং বাস্তবিকই, জানবেই-বা কে, লোকটা নিজে তো আর কিছু বলবে না— সে ছিল সবচেয়ে নির্বাক ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। এমনকি কেউ জানত না কী তার জীবিকা, কোনো কারুবৃত্তি ছিল না তার, কারো বাড়ি যেত না, মেলামেশা খুবই কম করত, কিন্তু তবুও খরচা করবার মতো টাকা তার ছিল; এ কথা সত্যি যে তার পরিমাণ কম, তবুও টাকা ছিল। হাবভাবটা তার বিনয়ীসুলভ নয় বটে, বিনয় কথাটা তার সম্বন্ধে একেবারে খাটে না— তবে শান্ত; নিজের মনে দিন কাটিয়ে যেত সে, চারপাশের লোকের দিকে দৃকপাত করত না, কিছুতেই কারো অপেক্ষা রাখত না।

বুনো বাবু এই ডাকনামটা সকলে মিলে তাকে দিয়েছিল, তার আসল নাম ছিল পেরেভ্লেসভ। সারা অঞ্চলে তার অমিত প্রভাব-প্রতিপত্তি; সকলে তাকে

এককথায় মানত, যদিও কারোর ওপর হুকুম জারি করার কোনো অধিকার তার ছিল না; কিন্তু যাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হত তাদের ওপর সে কর্তৃত্ব জাহির করতে যেত না। সে কিছু বললে সকলে তা পালন করত; শক্তির একটা নিজস্ব প্রভাব আছে। মদ সে প্রায় খেতই না, মেয়েদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না আর প্রাণ দিয়ে গান ভালোবাসত। মানুষটার মধ্যে অনেকটাই ছিল প্রহেলিকা, মনে হত যেন একটা বিশাল শক্তি তার মধ্যে গুমরিয়ে আছে, যেন জানা আছে, সেই শক্তি একবার যদি মাথা তোলে, একবার যদি মুক্ত হয়, তাহলে নিজেকে এবং সামনের যা কিছু সমস্তকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাবে। খুবই মনে হয় মানুষটির জীবনে এরকম ঘটনা আগেই ঘটেছে। আর ধ্বংসের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়ে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার জন্যেই যেন সে নিজেকে নির্মমভাবে এইভাবে লোহায় বেঁধে রেখেছে। তার স্বভাবে জন্মগত আদিম হিংস্রতার সঙ্গে সমান জন্মগত উদারতার এক মিলন বিশেষভাবে আমায় আশ্চর্য করেছিল— এই ধরনের মিশ্রণ আর কারোর মধ্যে আর চোখে পড়েনি।

যাই হোক, ঠিকাদার সামনে এগিয়ে গিয়ে আধবোজা চোখে উচ্চকণ্ঠে গান ধরল। একটু খসখসে হলেও তার গলাটা ভারি সুন্দর মিষ্টি। লাটিমের মতো তার গলায় সুর খেলতে লাগল, সে সুর কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে অবিরাম নেমে আসছে উপর থেকে নিচে, ফের নিচ থেকে চড়ায়, সযত্নে সেই চড়ায় সুরটাকে ধরে রেখে টেনে টেনে থেমে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ আবার চটুল ক্ষিপ্র একটা উদ্দামতায় ফিরে আসছে প্রথম তানে। তার এই সুরের খেলা এক এক সময় অত্যন্ত নির্ভীক, এক এক সময় মজাদার, সমঝদারেরা এতে খুবই খুশি হচ্ছিল, যদিও কোনো জার্মান শুনলে রেগে একেবারে খেপে যেত। এটা হল রুশি tenore di grazia, tenor leger।* একটা প্রাণচঞ্চল নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গে সে যে গানটা গাইতে লাগল, তার অফুরন্ত তান, ঝঙ্কার ও গমকের মধ্যথেকে আমি যে কথাক'টি উদ্ধার করতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই :

একফালি এক জমিন, কন্যা
তোমার লাগি করব চাষ,
সিঁদুর বরণ ফুল ফোটাব
তোমার তরে বারো মাস।

লোকটা গাইছে; সকলে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝেছে যে সত্যিকারের সংগীতরসিকদের আসরে গাইতে হচ্ছে, তাই প্রাণপণ চেষ্টায় যতদূর সম্ভব গানের মধ্যে দিয়ে উজাড় করে দিচ্ছিল নিজেকে, আর এই অঞ্চলের লোকেরাও সত্যি সত্যি গানের সমঝদার। ওরেলের রাজপথের উপর

* কাব্যিক তান।

সের্গিয়েভস্কয়ে গ্রাম সমস্ত রাশিয়ায় সুরেলা সমবেত সংগীতের জন্য যে প্রসিদ্ধ সেটা অকারণে নয়।

ঠিকাদারের গান প্রথমে শ্রোতার মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করতে পারেনি। সবাই মিলে তার গানের সঙ্গে ধুয়ো ধরছিল না। কিন্তু গানের বিশেষ এক কালোয়াতির জায়গায় বুনো বাবুর মুখে পর্যন্ত হাসি খেলে গেল, খ্যাপার এত আনন্দ হল যে উল্লাসধ্বনি চেপে রাখতে পারল না। সজীব হয়ে উঠল সকলে। খ্যাপা আর মিটমিটে কথায় কথা মিলিয়ে সুর টেনে মৃদু গলায় শাবাশ দিতে লাগাল, 'বেশ গেয়েছে!... বহুৎ আচ্ছা, টেনে ধর!... মন উজাড় করে দে শালা!' নিকোলাই ইভানিচ ভাঁটিখানার পেছনদিকে বসে সমর্থনসূচকভাবে মাথা নাড়ছিল। খ্যাপা শেষপর্যন্ত পা ঠুকে ঠুকে তালে তাল দিতে লাগল, আর কাঁধ নাচাতে লাগল, ইয়াকভের চোখদুটো হয়ে উঠল অঙ্গারের মতো উজ্জ্বল, আর পাতার মতো তার সারাশরীর কাঁপতে লাগল, মুখে একটা অযৌক্তিক হাসি। শুধু বুনো বাবুর মুখে কোনো পরিবর্তন হয়নি, সে আগের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওষ্ঠে তার অবজ্ঞাসূচক ভাব থাকলেও ঠিকাদারের ওপর তার নিবদ্ধ দুই চোখ কেমন যেন কোমল হয়ে উঠেছিল।

সকলের বাহবায় সাহস পেয়ে গিয়ে ঠিকাদার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এমন সুরের কম্পন ও কারুকার্য, এমন প্রবলভাবে গলার কাজ দেখাতে লাগল যে ঘেমে নেয়ে উঠে দম ফুরিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে সমস্ত শরীর পেছনে ঝাঁকিয়ে যখন সে তার গান অবশেষে শেষ করল তখন সকলের সম্মিলিত প্রশংসায় ও চিৎকারে ঘর ফেটে পড়ল। খ্যাপা তার গলা জড়িয়ে ধরে লম্বা লম্বা হাড্ডিসার হাত দিয়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে আর কী। নিকোলাই ইভানিচের থলথলে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠল, মনে হল যেন তার বয়স হঠাৎ কমে গেছে, ইয়াকভ পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'শাবাশ, শাবাশ!' আমার পাশের সেই ছেঁড়া কোর্তা পরা চাষিটাও নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'উহ্! শালার কী গানই গেয়েছে, তোফা!' তারপর খুব চূড়ান্ত ভাব করে একপাশে থুঃ করে থুতু ফেলল।

ক্লান্ত ঠিকাদারকে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেই খ্যাপা চিৎকার করে বলল, 'প্রাণ জল করে দিলে, ভাই! বলবার কিছু নেই, মন ভরে দিলে বটে! তুমিই জিতেছ ভাই, তোমারই জয় হয়েছে! বিয়ারের জালাটা তোমারই! ইয়াকভ তোমার সঙ্গে আর পারবে না, বলছি পারবে না, দেখে নিও আমার কথা!' (আবার সে ঠিকাদারকে বুকে চেপে ধরল।)

মিটমিটে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও বাপু, ওকে একটু রেহাই দাও, তোমার হাত থেকে দেখছি নিস্তার নেই ... আগে ওকে একটু বেঞ্চিতে বসতে দাও, দেখছ না, লোকটা হয়রান হয়ে গেছে। হাঁদা তো, একেবারেই হাঁদা! অমন করে ওর পেছনে লেগেছ কেন বলো তো, একেবারে এঁটুলির মতো।'

খ্যাপা উত্তর দিল, 'বেশ, তা আপত্তি কী, বসুক না, আমি ওর স্বাস্থ্যপান করি,' এই বলে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল আর ঠিকাদারের উদ্দেশে যোগ করে দিলে, 'এটা কিন্তু ভাই তোমার খরচায়।'

ঠিকাদার মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, বেঞ্চিতে বসে টুপির ভেতর থেকে একটা রুমাল বার করে নিজের মুখটা মুছতে শুরু করল, খ্যাপা ততক্ষণে লোভীর মতো তাড়াতাড়ি একনিশ্বাসে গেলাস শেষ করল, তারপর পাঁড় মাতালদের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে কীরকম চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ন হয়ে গেল।

নিকোলাই ইভানিচ সোহাগের স্বরে মন্তব্য করল, 'দিব্যি গেয়েছ ভাই, সুন্দর গেয়েছ। ইয়াকভ, এবার তোমার পালা। দেখো, ঘাবড়ে যেও না কিন্তু। দেখব কে কাকে হারায় ...তবে ভালোই গায় ঠিকাদার, ভগবানের দিব্যি, চমৎকার গান করে।'

'সত্যিই চমৎকার গায়', নিকোলাই ইভানিচের স্ত্রীও মন্তব্য করল আর হেসে চাইল ইয়াকভের দিকে।

আমার পাশে যে চাষিটা বসেছিল সে-ও মৃদুস্বরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে তার আঞ্চলিক উচ্চারণে বলল, 'চেমৎকার গো!'

শুনেই খ্যাপা হঠাৎ কাঁধ-ছেঁড়া কোর্তা পরা চাষিটার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওহ্, কোথাকার বুনো রে!' চাষিটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে অট্টহাস্য করে লাফাতে লাগল। 'হোঃ হোঃ! বলে কিনা চেমৎকার! বুনো কোথাকার! কোত্থেকে এক ভবঘুরে জংলি এসে জুটেছে এখানে।'

বেচারা চাষিটা বিব্রত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই মুহূর্তে বুনো বাবুর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল :

'এই! আচ্ছা অসহ্য জানোয়ার তো!' সে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল।

খ্যাপা বিড়বিড় করে বলল, 'আমি তো কিছু করিনি, কিচ্ছু না... আমি শুধু...'

'ঠিক আছে, চুপ করো!' বুনো বাবু তাকে ধমকে দিল, তারপর বলল, 'ইয়াকভ, এবার শুরু করো!'

ইয়াকভ নিজের গলাটায় হাত দিল :

'সত্যি ভাই, গলাটা কীরকম যেন ... ঠিক বুঝতে পারছি না, সত্যি বলছি, কিন্তু কীরকম যেন...'

'হয়েছে, হয়েছে, ঘাবড়াবার কী আছে... লজ্জার ব্যাপার!... উশখুশ করছ কেন? ভগবানের নাম করে শুরু করে দাও।'

তারপর বুনো বাবু চোখ নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ইয়াকভ এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে চতুর্দিকে চেয়ে হাতে মুখ ঢাকল। সকলের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ, বিশেষ করে ঠিকাদারের দৃষ্টি, যার মুখে আত্মবিশ্বাসের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ও বিজয়-উল্লাসের আড়ালে মৃদু অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে আগের মতোই সামনে ভর দিয়ে বসেছিল সে, কিন্তু আগের মতো আর পা দোলাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত যখন ইয়াকভ হাত

সরিয়ে নিলে তখন তার মুখ মৃতের মতো পাণ্ডুর হয়ে গেছে, আনত পল্লবের নিচে তার চোখদুটো মৃদুভাবে চিকচিক করছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গান গাইতে শুরু করল। প্রথমে তার গলা মৃদু ও অসমান শোনাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এ সুর যেন তার বুকের ভেতর থেকে আসছে না, এ সুর যেন বহুদূর থেকে ভেসে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। এই কম্পমান সুরের অনুরণন আমাদের ওপরে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল, পরস্পরের দিকে আমরা চাওয়াচাওয়ি করলাম, নিকোলাই ইভানিচের স্ত্রী সোজা হয়ে বসল। প্রথম এই সুরের পর দ্বিতীয় সুরটি আরো দৃঢ় আরো দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু সেটাও স্পষ্টতই কাঁপছিল, বীণার একটা তারে হঠাৎ কড়া আঙুলের আঘাতে সুরের মূর্ছনা উঠে কেঁপে কেঁপে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় যেমনভাবে। দ্বিতীয়টির পর এল তৃতীয় সুর এবং ক্রমে সেই সুর আরো বিস্তৃত আরো প্রবল হয়ে করুণ সংগীতে মূর্ত হয়ে উঠল। সে গাইল, 'অনেক পথই যায় রে সেই মাঠের কিনারে।' আমাদের কানে তা বড় মিষ্টি, বড় করুণ শোনাল। স্বীকার করতেই হয় এরকম গলা খুব কমই শুনেছি, অল্প ভাঙা ভাঙা নিখুঁত মাজাঘষা নয়, প্রথমে তা একটু অসুস্থও লাগছিল, কিন্তু গলার সুরে অকপট আবেগের গভীরতা, তারুণ্য, ক্ষমতা ও মিষ্টতা, তার সঙ্গে একটা মন-কাড়া উদাস অভিমান। সেই গলার সুরে ধ্বনিত ও শ্বসিত হয়ে উঠল এক অকপট, উদ্দীপিত রুশ হৃদয়, সেটা সোজা গিয়ে পৌঁছায় বুকের মধ্যে, রুশি তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে। গানের স্রোত ফুলে ফুলে উঠে বসে যেতে লাগল। বোঝা গেল ইয়াকভকে গানে পেয়েছে এবার, এখন তার আর সঙ্কোচ নেই, সমস্ত আবেগ দিয়ে সে গাইছে। গলা আর তার কাঁপছে না, দুলে উঠছে আবেগের প্রায় অলক্ষ এক আভ্যন্তরীণ দোলনে যা শ্রোতাদের মনে গিয়ে তীরের মতো বেঁধে; তার সুরের শক্তি, দৃঢ়তা ও বিস্তৃতি ক্রমেই বেড়ে উঠল। মনে পড়ে সমুদ্রের সমতল বালুকাবেলায় সূর্যাস্তের সময় একবার ভাটির দূরাগত ভয়ঙ্কর গুরুভার গর্জনের মধ্যে বিরাট একটা সাদা গাংচিল দেখেছিলাম; পাখিটা স্থির হয়ে বসেছিল, তার রেশম চিক্কণ বুকে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা, মাঝে মাঝে শুধু সেই বিরাট পাখাদুটো আন্দোলিত হয়ে উঠছে তার অতিপরিচিত সমুদ্র আর অস্তগামী রক্তসূর্যের পানে। ইয়াকভের গান শুনতে শুনতে সেই পাখিটার কথা মনে পড়ছিল।

ইয়াকভ গাইতে লাগল তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমাদের সকলের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে; কিন্তু বোঝা গেল নির্ভীক সাঁতারুকে ঢেউ যেমন তুলে ধরে, তেমনি আমাদের সকলের নির্বাক প্রবল সাযুজ্যে সে-ও যেন উঁচু হয়ে উঠেছে। সে গাইছে, আর তার গলার সুরের প্রতিটি ধ্বনিতে আমরা যেন প্রিয় অন্তরঙ্গ কোনোকিছুর আস্বাদ পেতে লাগলাম, বিশালতার অনুভূতি যেন হল, যেন পরিচিত স্তেপের প্রান্তর আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে বিস্তৃত হতে হতে সুদূর

অসীমে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমি অনুভব করলাম আমার বুকের ভেতরে কান্না জমছে আর দুটো চোখ ছাপিয়ে উঠছে সেই অশ্রু।

হঠাৎ কানে এল চাপা কান্নার শব্দ। চারপাশে তাকালাম— দেখলাম ভাঁটিখানার মালিকের স্ত্রী কাঁদছে জানালার কাছে বুক চেপে। ইয়াকভ তার দিকে একপলক তাকিয়ে আরও ঝঙ্কৃত আরো মধুর করে সুর ঢেলে দিল; নিকোলাই ইভানিচ চোখ নামিয়ে নিল, মিটমিটে অন্যদিকে তাকাল; খ্যাপা একেবারে গলে গিয়ে বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। গরিব চাষিটা এককোণে বসে ফোঁসফোঁস করছিল আর করুণ গুঞ্জন করতে করতে মাথা নাড়ছিল; আর বুনো বাবুর বজ্রকঠিন মুখে, তার ঝোলা ভুরুর নিচে ধীরে ধীরে একবিন্দু ব্যথাতুর অশ্রু টলমল করে উঠল চোখে। ঠিকাদার তার মুঠো করা হাতটা তুলল কপালে, একটুও নড়ল না ... ইয়াকভ হঠাৎ যদি অসাধারণ তীক্ষ্ণ চড়া সুরে ঠিক গলা ভেঙে যাওয়ার মতো করে গানটা শেষ করে না ফেলত তাহলে এই আবেগের পরিণতি কী হত জানি না। কেউ চেঁচিয়ে উঠল না, একটু নড়লও না কেউ, সবাই যেন প্রতীক্ষা করছে বুঝি সে আরও গাইবে। কিন্তু আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে যেন বিস্মিত হয়ে সে চোখ খুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল, দেখল জয় তারই হয়েছে ...

বুনো বাবু তার কাঁধের উপরে হাত রেখে একবার শুধু বলল, 'ইয়াকভ।' তার মুখে আর কোনো ভাষা বেরোল না।

আমরা সকলে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, ঠিকাদার আস্তে আস্তে উঠে ইয়াকভের দিকে এগিয়ে গেল, অতিকষ্টেই সে উচ্চারণ করল, 'তুমি... তুমি... তুমিই জিতেছ।' তারপর ঘর থেকে ছুটে চলে গেল...

তার দ্রুত নিষ্ক্রমণ যেন ঘরের মন্ত্রমুগ্ধ ভাবটাকে ভেঙে দিল, আমরা সকলে হৈচৈ করে সানন্দে আলাপ শুরু করে দিলাম। খ্যাপা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তোতলাতে তোতলাতে হাওয়াকলের পালের মতো হাত নাড়াতে লাগল; মিটমিটে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইয়াকভের কাছে গিয়ে তাকে চুমু খেতে শুরু করে দিল। নিকোলাই ইভানিচ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করল যে সে নিজের থেকে আরো একজালা বিয়ার দেবে সকলকে খেতে। বুনো বাবু কেমন একধরনের ভালোমানুষি হাসি হাসতে লাগল যা তার মুখে দেখব প্রত্যাশা করিনি; গরিব চাষিটা তার কোণে বসেই জামার আস্তিন দিয়ে চোখ গাল নাক আর দাড়ি মুছতে মুছতে বারবার বলতে লাগল, 'সুন্দর, ভগবানের দিব্যি কী সুন্দর! নইলে কুত্তার বাচ্চা বলো আমায়, সুন্দর!' আর নিকোলাই ইভানিচের স্ত্রীর সমস্ত মুখ হয়ে উঠেছিল আরক্তিম, তাড়াতাড়ি সে উঠে চলে গেল।

নিজের এই জয় ইয়াকভ একটি শিশুর মতো উপভোগ করছে, তার সমস্ত মুখ বদলে গিয়েছে, বিশেষ করে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। সকলে

তাকে টেনে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল, সে হাতছানি দিয়ে ক্রন্দনরত চাষিটাকে ডাকল, আর ভাঁটিখানার মালিকের ছোটছেলেটাকে পাঠাল ঠিকাদারকে খুঁজতে; কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। যা হোক, তারপর ভোজ শুরু হয়ে গেল। খ্যাপা শূন্যে ভয়ানক হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'তোমায় আবার গাইতে হবে, সন্ধে পর্যন্ত তোমাকে গাইতে হবে।'

ইয়াকভের দিকে আর একবার তাকিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পাছে আমার অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে আমি থাকতে চাইনি। কিন্তু বাইরে আগের মতোই অসহ্য গরম। যেন মাটির উপরে গরমের একটা ঘন ভারি আস্তরণ ঝুলছে। ঘন নীল আকাশে মনে হল যেন সূক্ষ্ম প্রায় কালো ধূলিজালের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট কিসের উজ্জ্বল অগ্নিকণা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সবকিছু নিস্তব্ধ, ক্লান্ত। প্রকৃতির গম্ভীর স্তব্ধতায় এমন কিছু ছিল যা পীড়াদায়ক, যা হতাশাজনক। আমি একটা বিচালির চালার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘাসগুলো সদ্য-কাটা হলেও প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুম এল না, অনেকক্ষণ ধরে ইয়াকভের অপ্রতিরোধ্য গলার সুর আমার কানে ঝঙ্কৃত হল... অবশেষে গরম আর অবসাদের প্রভাবে আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। যখন জেগে উঠলাম, তখন অন্ধকারে চারদিক ডুবে গেছে, চারপাশে ছড়ানো বিচালি থেকে সামান্য ভিজে তীব্র গন্ধ নাকে আসছে, আধখোলা চালার সরু সরু বরগার ফাঁক দিয়ে পাণ্ডুর তারাগুলো মিটমিট করছে।

বাইরে বেরোলাম। সূর্যাস্তের আভা অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে, দিগন্তে তার অন্তিম অস্তিত্বের আবছা আভাস, কিন্তু অনতিপূর্বের দগ্ধ বাতাসে রাত্রির শীতলতা ছাপিয়ে গরমের অনুভূতি তখনো বিরাজ করছে, একঢোক ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য প্রাণ হাঁপাচ্ছে। বাতাস নেই, মেঘও নেই কোথাও। সমস্ত আকাশ নির্মল, স্বচ্ছ কালো, অসংখ্য প্রায় অদৃশ্য তারার ঝিকিমিকি তাতে। সারা গ্রামের চারদিকে মিটমিটে আলো, কাছের উজ্জ্বল ভাঁটিখানা থেকে বেসুরো বিশৃঙ্খল আওয়াজ আসছে, তার মধ্যে মনে হল যেন ইয়াকভের গলা শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে প্রবল অট্টহাসির হররা আসছে মাঝে মাঝে। ছোট জানালাটার কাছে গিয়ে আমি শার্সিতে মুখ রেখে দেখতে লাগলাম। বৈচিত্র্যপূর্ণ সজীব হলেও এক নিরানন্দ দৃশ্য চোখে পড়ল : ইয়াকভ থেকে শুরু করে সবাই মাতাল হয়ে গিয়েছে। খোলা বুকে সে একটা বেঞ্চিতে বসে মোটা গলায় একটা নাচের সুরে রাস্তার গান গাইছে আর অলসভাবে গিটারে ঝঙ্কার তুলছে। তার ভীষণ পাণ্ডুর মুখের উপর ভিজে চুলের গোছা ঝুলছে। ধূসর রঙের কোর্তা পরা চাষিটার সামনে সম্পূর্ণ 'বেসামাল' হয়ে কোট খুলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে খ্যাপা, চাষিটাও কষ্টেসৃষ্টে কোনোরকমে দুর্বল পা ঠুকে ঠুকে নাচবার চেষ্টা করছে আর এলোমেলো দাড়ির ফাঁকে অর্থহীনভাবে হাসছে, মাঝে মাঝে একটা হাত নেড়ে যেন বলতে চাইছে,

'কী জমেছে!' এমন হাস্যকর মুখ আর হয় না; যতই ভুরু টেনে তোলার চেষ্টা করুক না কেন তার ভারি চোখের পাতা আর উঠছে না, প্রায় অলক্ষ, ঝাপসা আর ভারি পরিতৃপ্ত চোখদুটিকে ঢেকেই রেখেছে। একেবারে মাতাল হলে যেরকম খুশির মেজাজ হয় তেমনি অবস্থা তার, যে অবস্থায় পথে দেখলে লোকে নির্ঘাত বলে ওঠে, 'বাহবা ভায়া, বাহবা!' বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে মিটমিটে গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে গিয়ে ঘরের এককোণে বসে বাঁকা হাসি হাসছে। একলা শুধু নিকোলাই ইভানিচই খাঁটি শুঁড়ির মতো তার অবিচল উদাসীনতা বজায় রেখেছে। ঘরটা অনেক নতুন মুখে ছেয়ে গিয়েছে, কিন্তু বুনো বাবুকে দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি ফিরলাম। যে টিলাটার উপর কলতাভ্‌কা অবস্থিত সেখান থেকে নামতে লাগলাম। পাদদেশে সমতল প্রশস্ত প্রান্তর প্রসারিত; সান্ধ্য কুয়াশার ঢেউয়ে ডুবে প্রান্তরটাকে আরো অসীম মনে হচ্ছে, যেন আঁধার হয়ে আসা আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। খাদের পাশের রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথাও কোনো বহুদূর থেকে একটা ছেলের স্পষ্ট গলা ভেসে আসতে লাগল, 'আন্ত্রোপ্‌কা! আন্ত্রোপ্‌কা-আ-আ!'... শেষের ধ্বনিটা টেনে টেনে একগুঁয়ে কান্নাভেজা হতাশায় হাঁক দিচ্ছিল সে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আবার সে হাঁক দিতে শুরু করল। লঘু তন্দ্রাভরা নিশ্চল বাতাসে ভেসে আসছিল তার গলার ঝঙ্কার। অন্তত তিরিশবার সে আন্ত্রোপ্‌কার নাম ডেকেছে, হঠাৎ প্রান্তরের ওপার থেকে, যেন অন্য জগৎ থেকে, প্রায় শোনাই যায় না এমন জবাব এল :

'কী-ঈ-ঈ?'

ছেলেটার গলা সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত রাগে প্রত্যুত্তর দিল :

'এদিকে আয়, বুনো শয়তান কোথাকার!'

অনেকক্ষণ পরে অন্যজন আবার সাড়া দিল, 'কেন, কী জ-ন্যে?'

প্রথমজন তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'বাবা তোকে পিটবে বলে!'

দ্বিতীয়জন আর সাড়া দিল না, আর ছেলেটা আবার আন্ত্রোপ্‌কা বলে চেঁচাতে লাগল। তার চিৎকার মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে কমতে কমতে তখনো আমার কানে আসছিল, যখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, আর আমি ঘুরে গিয়েছি কলতোভ্‌কা থেকে মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত আমার গ্রামের সংলগ্ন বনের বাঁকটায়... 'আন্ত্রোপ্‌কা-আ-আ!' নৈশ ছায়া-ভরা বাতাসে তখনো শোনা যাচ্ছিল ডাকটা।

তলস্তয় লেভ নিকোলায়েভিচ (১৮২৮-১৯১০)— প্রতিভাধর শিল্পী ও মনস্বী, বিশ্বসাহিত্যে বিচারমূলক বাস্তবতার এক সেরা প্রতিনিধি, বিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আন্না কারেনিনা', 'পুনরুজ্জীবন'-এর লেখক।

'বল-নাচের পর' (১৯০৩) গল্পটি তলস্তয়ের শেষদিককার একটি রচনা।

লেভ তলস্তয়
বল-নাচের পর

'তাহলে আপনারা বলছেন ভালোমন্দর স্বাধীন বিচারশক্তি মানুষের নেই, সব হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপার, মানুষ পরিবেশের ক্রীড়নক। কিন্তু আমার মনে হয় সব হল দৈবের হাতে। নিজের বিষয়ে বলি শুনুন...'

বললেন আমাদের সকলের মাননীয় বন্ধু ইভান ভাসিলিয়েভিচ একটি আলোচনার উপসংহারে। ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য আগে দরকার পরিবেশ বদলানো, যে অবস্থায় লোকে আছে সে অবস্থাটা বদলানো— এই নিয়ে চলেছিল আমাদের কথাবার্তা। সত্যি বলতে, ভালো বা মন্দ'র বিচারশক্তি অসম্ভব— এমন কথা কেউ বলেনি; কিন্তু ইভান ভাসিলিয়েভিচের অভ্যেস ছিল, আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মনেই যেসব ভাবনা উঠেছে তারই জবাব দেওয়া এবং সেই উপলক্ষে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলা। মাঝে মাঝে গল্পতে তিনি এত মত্ত হয়ে যেতেন যে কেন বলছেন মনে থাকত না, বিশেষ করে এজন্য যে তিনি সর্বদা গল্প বলতেন গভীর আন্তরিকতায় ও সততায়।

এবারেও তিনি তাই করলেন।

'আমার কথা বলি। ওভাবে নয়, আমার সারা জীবনটাই গড়ে উঠেছে অন্যভাবে— পরিবেশের দরুন নয়, সম্পূর্ণ অন্যকিছুর ফলে।'

'কিসের ফলে?' আমরা শুধালাম।

'সে অনেক কথা। বুঝতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়।'

'বলুন-না শুনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুহূর্তখানেক ভেবে নিলেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

'হ্যাঁ', তিনি বললেন, 'একটা রাত্রি, বরং একটা সকাল— আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।'

'কী হয়েছিল?'

'হয়েছিল কী— দারুণ প্রেমে পড়েছিলাম। অনেকবার প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এমন গভীরভাবে নয়। অনেকদিন আগেকার কথা— ওর মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে। তার নাম ব..., ভারেঙ্কা ব...' মহিলার পদবিটা বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ। 'পঞ্চাশেও তার চেহারা ছিল তাকিয়ে দেখার মতো; কিন্তু যৌবনে, আঠারো বছর বয়সে ও ছিল মোহিনী : দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম লাবণ্যময়ী, রানির মতো; হ্যাঁ ঠিক রানির মতো। ভঙ্গিটা ছিল একেবারে খাড়া, যেন খাড়া না থেকে সে পারেই না। মাথাটা থাকত একটু পিছনে হেলানো; রোগা বলতে কী হাড্ডিসার হলেও এটা তার দীর্ঘাকৃতি ও রূপের সঙ্গে মিলে চেহারায় এমন একটা রানির মতো ভাব আনত যে লোকে সভয়ে পিছিয়েই যেত যদি না তার হাসিটা হত এত উচ্ছল, মন ভোলানো, চোখদুটো এত অপরূপ দীপ্ত, যদি না তার যৌবনোচ্ছল সত্তায় থাকত এত মোহ।'

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ বর্ণনা দিতে পারেন বটে!'

'যতই বর্ণনা দিই আপনাদের বোঝাতে পারব না সে দেখতে কেমন ছিল। তবে সেটা অন্য কথা। যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা ঘটে পঞ্চম দশকে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। জানি না ভালো কি মন্দ, কিন্তু সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের না ছিল কোনো পাঠচক্র, না ছিল মতবাদের বালাই; আমরা ছিলাম শুধু নওজোয়ান আর থাকতাম ঠিক জোয়ানদের মতো, পড়াশুনো করতাম আর ফুর্তি চালাতাম। অত্যন্ত ফুর্তিবাজ তুখোড় ছোকরা ছিলাম আমি— তারপর পয়সাকড়ি ছিল মন্দ নয়। একটা তেজি ঘোড়ার মালিক, মেয়েদের নিয়ে স্লেজে চেপে পাহাড় গড়িয়ে নামতাম (স্কেটিং-এর রেওয়াজ তখনো আসেনি); বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম মদের আড্ডায় (সেসব দিনে শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু ছুঁতাম না; পকেটে পয়সা না থাকলে কিছুই খেতাম না, আজকালকার মতো ভোদকা চলত না আমাদের); কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল পার্টি আর বল-নাচ। নাচতাম ভালোই, চেহারাটাও কুৎসিত ছিল না।'

'থাক, আর বিনয় করবেন না', একটি শ্রোতা বললেন। 'আপনার ফটো আমরা সবাই দেখেছি। খারাপ কেন, চেহারাটি খাসা ছিল আপনার।'

'হয়তো ছিল, কিন্তু কথাটা ওটা নিয়ে নয়। কথাটা হল, আমার সে সময় হাবুডুবু প্রেম। স্রোভটাইডের শেষদিনে গেছি একটা বল-নাচে মার্শালের ওখানে; বৃদ্ধটি দিলদরাজ, ধনী, অতিথি আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী ঠিক স্বামীর মতো অমায়িকভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। পরনে মখমলের গাউন, মাথায় হীরের টায়রা, বার্ধক্যের ছাপ লাগা গোলগাল সাদা গলা আর কাঁধ খোলা, মহারানি ইয়েলিজাভেতা পেত্রভনার ছবির মতন। অপরূপ নাচের আসর, অর্কেস্ট্রার মঞ্চ, বাজনদাররা হল সে সময়কার সংগীতপ্রিয় এক জমিদারের

নামকরা ভূমিদাসদল। খাদ্যের অভাব নেই, শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। শ্যাম্পেনের বড় অনুরাগী হলেও খেলাম না— বিনা মদেই আমি তখন প্রেমের নেশায় মশগুল। কিন্তু নাচে বিরাম দিইনি, নাচতে নাচতে পড়ে যাবার মতো দশা। কোয়াড্রিল নাচলাম, নাচলাম ওয়ালজ আর পলোনেজ, আর বলাবাহুল্য যতটা পারি নাচলাম কেবলি ভারেঙ্কার সঙ্গে। তার গায়ে গোলাপি ফেটি দেওয়া সাদা পোশাক, হাতে নরম চামড়ার লম্বা দস্তানা সরু ছুঁচলো কনুই পর্যন্ত ঠিক পৌঁছায়নি, পায়ে সাদা শাটিনের জুতো। আনিসিমভ নামে হতচ্ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাজুরকা নাচল ওর সঙ্গে। এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করিনি সেজন্য। সেলুনে গিয়েছিলাম, পরিচারকের কাছে দস্তানা নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, নাচের ঘরে ভারেঙ্কা ঢোকামাত্র আনিসিমভ ওকে নাচতে বলল। তাই ওর সঙ্গে না নেচে মাজুরকাটা নাচতে হল একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে, তার ওপর একসময়ে আমার একটু ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিনি, কথা বলিনি, তাকাইনি পর্যন্ত তার দিকে, আমার চোখজোড়া পড়ে ছিল শুধু গোলাপি ফেটি দেওয়া সাদা পোশাক পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ের ওপর, যার টোল পড়া গাল, উজ্জ্বল আরক্তিম মুখ, মধুর স্নিগ্ধ যার চোখ। শুধু আমি নই, সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল, মায় মেয়েরা পর্যন্ত, যদিও ওর দীপ্তিতে সবাই হতশ্রী। মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

'নিয়মমতো দেখলে মাজুরকায় ও আমার জুড়ি ছিল না, কিন্তু আসলে প্রায় সবসময় নাচি ওরই সঙ্গে। ঘরের অন্যদিক থেকে ও বারবার সোজা আসে আমার কাছে অসঙ্কোচে, ডাকের অপেক্ষা না করে আমিও তাল মেলাই ওর সঙ্গে আর ও মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানায় আমার অনুমান-কৃতিত্বে। নাচের সঙ্গী বাছাই-এর সময়ে যখন আমার গুণ* ওর কাছে ধরা পড়ত না, তখন রোগা কাঁধ একটু ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে খেদ ও সান্ত্বনার হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিত অন্য একজনের দিকে।

'মাজুরকার তালে ওয়াল্‌জ্‌ শুরু হল, অনেকক্ষণ ওয়াল্‌জ্‌ নাচলাম ওর সঙ্গে, হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ও বলছিল, 'Encore।'** আর আমি ওর সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছি তো নাচছি, শরীরের কোনো হুঁশ নেই।'

'হুঁশ ছিল না, মানে? ওর কোমর জড়িয়ে হুঁশটা বেশ প্রখর হয়েছিল মনে হচ্ছে— শুধু নিজের শরীরের নয়, ওরও', অতিথিদের একজন বললেন।

হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে উঠে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ :

'সেটা আপনাদের, আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের হতে পারে। দেহ ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেন না। আমাদের দিনকালে অন্যরকম ছিল।

* কোনো কোনো নাচে এক-একজনে এক-একটি গুণের প্রতিম হত।

** লক্ষ্মীটি (ফরাসি ভাষায়)।

কাউকে বেশি ভালোবাসলে অদেহী মনে হত তাকে। আজকাল আপনারা মেয়েদের পা, পায়ের গোছ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সচেতন সজাগ, যাদের ভালোবাসেন তাদের বিনাবস্ত্রে দেখেন, কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, আলফোঁস কার যেমন বলেছিলেন— পাকা লেখক ছিলেন তিনি— আমরা প্রেমিকাকে সর্বদা দেখতাম ব্রোঞ্জের পোশাকে। বিনাবস্ত্রে দূরের কথা, আমরা চাইতাম নগ্নতাকে ঢাকতে, যেমন চেয়েছিল নোয়ার সুসন্তান। কিন্তু আপনাদের মাথায় এটা ঢুকবে না...'

'ওর কথায় কান দেবেন না। গল্পটা চালিয়ে যান', বললেন আর একজন শ্রোতা।

'হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময়ে ওর সঙ্গে নাচলাম, সময়ের হুঁশ ছিল না। ক্লান্তিতে বাজিয়েদের হাঁফ ধরে গিয়েছে— বল-নাচের শেষটায় কেমন হয় জানেন তো— ওরা একটার পর একটা বাজিয়ে চলেছে কেবলি মাজুরকা; সাপারের প্রত্যাশায় ড্রয়িংরুমের তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ছেন বাপ-মায়েরা; চাকরগুলো এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে। দুটো বেজে গেছে। শেষ মুহূর্তগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হয়। ওকে আবার ডাকলাম নাচতে, আবার প্রায় একশ বারের বার ঘরময় নেচে বেড়ালাম ওর সঙ্গে।

'সাপারের পর আমার সঙ্গে কোয়াড্রিলটা নাচবেন তো?' ওর বসার জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে যেতে জিগ্যেস করলাম।

'নাচব বইকি, অবশ্য যদি বাড়ি যেতে না হয়', মৃদু হেসে ও বলল।

'যেতে দেব না আপনাকে', আমি বললাম।

'হাতপাখাটা দিন তো', বলল ও।

'ফেরত দিতে হচ্ছে বলে মনে বড় ব্যথা পাচ্ছি', সস্তা সাদা পাখাটা দিতে দিতে বললাম।

'আহা, ব্যথা পেতে হবে না, এই নিন', পাখার একটা পালক ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে ও বলল।

'পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা জানালাম শুধু আমার চোখ দিয়ে। শুধু যে আনন্দ আর তৃপ্তিতে মন ভরে উঠেছে, তা নয়; আমি সুখী, চরম সুখী, মনটা দরাজ হয়ে গিয়েছে, আমি আর আমি নই, আমি তখন অপার্থিব কোনো প্রাণী; হিংসাদ্বেষ যে জানে না, ভালো বই মন্দ করতে পারে না।

দস্তানায় পালকটা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওকে ছেড়ে যাবার শক্তি নেই।

'দেখছেন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে', দোরগোড়ায় গৃহকর্ত্রী ও অন্য কয়েকটি মহিলার সঙ্গে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘদেহ, জমকালো চেহারার ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও বলল। ওর বাবা কর্নেল, টিউনিকের কাঁধে রুপোর কাজ করা ইপলেট।

'হীরের ট্যায়রা-পরা গৃহকর্ত্রী, কাঁধ যার ইয়েলিজাভেতার মতো, ডেকে বললেন,'ভারেঙ্কা, এদিকে এসো তো!'

ভারেঙ্কা দরজার দিকে গেল, আমি তার পিছু পিছু।

'Ma chere,* বাবাকে বলে কয়ে সঙ্গে নিয়ে নাচো না। দয়া করে নাচুন, পিওতর ভ্লাদিস্লাভিচ', কর্নেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

'ভারেঙ্কার বাবা বেশ লম্বা আর জমকালো, চেহারাটি অত্যন্ত সুন্দর; বুড়ো হলেও বেশ তাজা। টকটকে লাল মুখে সাদা গোঁফজোড়া প্রথম নিকোলাইয়ের কায়দায় পাক দেওয়া, সাদা জুলফি নেমে এসেছে গোঁফের দিকে, রগ থেকে চুল সটান সামনে আঁচড়ানো, উজ্জ্বল চোখে আর ঠোঁটে ঠিক মেয়ের মতো সানন্দ হাসি। বেশ সুন্দর সুঠাম গড়ন, চওড়া বুক ফৌজি কায়দায় চেতানো, সম্মান পদকের ঘটা তত নেই, কাঁধজোড়া শক্ত, পাদুটো লম্বা আর সুগঠিত। নিকোলাইয়ের রেওয়াজের সেকেলে কায়দার অফিসার।

দরজার কাছে গিয়ে দুজনে শুনলাম তিনি আপত্তি করে বলছেন নাচতে ভুলে গিয়েছেন; তবু একটু হেসে বাঁ-হাতে খাপসুদ্ধ তলোয়ার খুলে সেবাতৎপর একটি ছোকরাকে দিলেন, ডান হাতে সোয়াডের একটা দস্তানা চাপিয়ে— মুচকি হেসে বললেও, 'নিয়মমাফিক চলা চাই', তারপর মেয়ের হাত ধরে এক চক্কর ঘোরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠিক তালের অপেক্ষায় রইলেন।

'মাজুরকার তাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চট করে একটা পা ছুড়ে আরেক পায়ে তাল ঠুকলেন তিনি, ঘরময় ভাসতে লাগল তার দীর্ঘ ভারি দেহ— কখনো শান্ত মসৃণ, কখনো-বা উদ্দাম সশব্দ ভঙ্গিতে। পায়ে পায়ে তাল ঠুকে তার পাশে ভাসছে ভারেঙ্কার সাবলীল শরীর। তার ছোট সাদা শাটিনের জুতো পরা পায়ের পদপাত কখনো দীর্ঘায়ত কখনো-বা সঙ্কুচিত করে প্রায় অলক্ষে তাল দিয়ে গেল সে। দুজনের প্রতিটি ভঙ্গি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অতিথিরা। আমার যে ভাবটা হয় সেটা তারিফের শুধু নয়, ঘোর উচ্ছ্বাসের। মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল কর্নেলের বুটজোড়া। বাছুরের চামড়ায় তৈরি ভালো বুট, তবে হিল নেই, সামনের দিকটা চারকোণা, হাল-ফ্যাশানি ছুঁচলো নয়। দেখে মনে হয় ব্যাটেলিয়নের মুচি বানিয়েছে বুটজোড়া। মনে হল, 'আদরের মেয়েকে সাজগোজ করিয়ে ভদ্র সমাজে আনার জন্য শৌখিন জুতোর বদলে উনি নিজে পরেন ঘরে তৈরি বুট', আর সামনে চারকোনা ওঁর বুটজোড়া দেখে বিশেষ বিচলিত লাগল। বেশ বোঝা গেল এককালে তিনি ভালো নাচতেন, কিন্তু শরীরটা এখন ভারি হয়ে গিয়েছে, পাদুটোর সেই তৎপরতা আর নেই বলে ক্ষিপ্র খাসা চালগুলো চেষ্টা সত্ত্বেও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দুবার ঘরময় বেশ ঘুরলেন তিনি, আর পাদুটো চকিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার খট করে জোড়া

* লক্ষ্মীটি (ফরাসি ভাষায়)।

লাগিয়ে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, অবশ্য একটু ভারি কায়দায়, যখন বসে পড়লেন আর আটকে যাওয়া স্কার্টটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ে মুচকি হেসে সাবলীলভাবে যখন পাক দিল তার চারদিকে, তখন সবাই সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। কিছুটা চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথা চেপে চুমু খেলেন কপালে, তারপর নিয়ে এলেন আমার কাছে, ভেবেছিলেন ওর নাচের সঙ্গী আমি। জানালাম তা নয়।

'কিছু এসে যায় না তাতে; নাচুন ওর সঙ্গে', খাপসুদ্ধ তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে সস্নেহে হেসে বললেন।

'বোতল থেকে একবার প্রথম ফোঁটা বেরুবার পর জল যেমন হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভারেঙ্কার ওপর ভালোবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসার পথ খুলে দিল। সে সময় আমার প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ল গোটা পৃথিবীটা। ভালোবাসলাম রানি ইয়েলিজাভেতার মতো যাঁর বুক সেই হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রীকে, তাঁর স্বামীকে, অতিথিদের, চাকরবাকরদের, এমনকি ইঞ্জিনিয়ার আনিসিমভকে, যে আমার ওপর বেজায় চটেছিল। আর চারকোনা ঘরোয়া বুটপরা ওর বাবা, হাসিটা যাঁর ঠিক মেয়ের মতো— তাঁর প্রতি যে অনুরাগ বোধ করেছিলাম সেটা একেবারে উদ্বেলিত।

'মাজুরকা শেষ হতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী সাপারের টেবিলে ডাকলেন আমাদের। কর্নেল ব ... অনিচ্ছা জানালেন। খুব ভোরে উঠতে হবে তাঁকে, এই বলে গৃহস্বামীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ভয় হল বুঝি ভারেঙ্কাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

'সাপারের পর প্রতিশ্রুত কোয়াড্রিল নাচলাম ওর সঙ্গে। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশি সুখ আর হতে পারে না, কিন্তু সুখ আমার উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে প্রেমের কথা কিছু হল না; আমাকে ভালোবাসে কিনা সে কথাটাও জিগ্যেস করলাম না— না ওকে, না নিজের কাছে। ওকে ভালোবাসি, তাই যথেষ্ট। ভয় হচ্ছিল শুধু একটা, এ সুখ নষ্ট হয়ে যাবে না তো।

'বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব। আমার হাতে ওর হাতপাখার পালক আর গোটাগুটি একটা দস্তানা, গাড়িতে ওকে আর ওর মাকে তুলে দেবার সময়ে আমাকে দিয়েছিল শেষেরটা। জিনিসদুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার চোখের সামনে দেখলাম সেই মুহূর্তটি যখন নাচের সঙ্গী বাছতে গিয়ে আমার গুণ আন্দাজ করতে পেরেছে সে, কানে এল তার মিষ্টি গলা, 'গৌরব? তাই না?' তারপর সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার দিকে; কিম্বা যখন সাপারের টেবিলে বসে শ্যাম্পেন খেতে খেতে অনুরাগ ভরা চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ওকে দেখলাম সেই সময়ে যখন

বাপের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে নাচছিল সে, বাপের এবং নিজের দরুন খুশিতে আর গর্বে তাকাচ্ছিল মুগ্ধ দর্শকদের দিকে। আর অজান্তেই তারা দুজনে মিশে গেল আমার মনের এক গভীর কোমল অনুভূতিতে।

'আমার বিগত ভাই আর আমি তখন একলা বাড়িতে থাকতাম। সমাজ-টমাজে কোনো ঝোঁক ছিল না ভাইয়ের, বল-নাচে কখনো যেত না। এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন, তার জীবনযাপনের ধরনটা খুবই নিয়মমাফিক। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কম্বলে আধো ঢাকা, বালিশে গোঁজা তার মুখ দেখে মায়া হল— আহা, বেচারি জানে না আমার কী সুখ, সে সুখের ভাগ নিতেও পারবে না ও। আমাদের ভূমিদাস খাস চাকর পেত্রুশা বাতি হাতে এল জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিতে আমার, কিন্তু ছুটি দিলাম ওকে। লোকটার ঘুমজড়ানো মুখ আর এলোমেলো চুল দেখে মমতা হল। পাছে কোনো শব্দ হয়, পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে বসলাম। এত সুখ আমার মনে, ঘুম এল না। ঘরে গরম লাগাতে ইউনিফর্ম না খুলেই চুপিচুপি সদর ঘরে এসে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম।

'বল-নাচ থেকে যখন চলে আসি তখন চারটা বেজে গেছে, বাড়ি পৌঁছে বসে থেকে তারপর প্রায় দুঘণ্টা কেটেছে; বেরোলাম যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। স্রোভটাইডের সেই বিশেষ আবহাওয়া— কুয়াশা, ভিজে বরফ গলছে রাস্তায়, ছাত থেকে টুপটুপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। শহরের উপকণ্ঠে একটা খোলা মাঠের কিনারে তখন থাকত ভারেঙ্কারা, মাঠের একদিকে মেয়েদের কলেজ, অন্যদিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের নির্জন গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তায় গেলাম; চোখে পড়ছিল, মাঝে মাঝে পথচারী, আর কাঠ বোঝাই শ্লেজ নিয়ে চালকেরা যাচ্ছেই, শ্লেজের রানারগুলো রাস্তার বরফ কেটে প্রায় পাথর ঘেঁষে চলেছে; আর সবকিছু— ভিজে চকচকে জোয়ালের নিচে তালে তালে মাথা ওঠা-নামা করা ঘোড়াগুলো, শ্লেজগুলোর পাশে পাশে গায়ে গাছের ছালের চাটাই চাপিয়ে বিরাট জুতোয় বরফ কাদা ভেঙে যাওয়া চালকেরা আর পথের দুধারে কুয়াশায় যে ঘরবাড়িগুলোকে ভারি উঁচু মনে হচ্ছিল— সবকিছু মনে হল বিশেষ রকমের মধুর ও অর্থময়।

'যে মাঠে ওদের বাড়ি সেখানে পৌঁছিয়ে বেড়াবার জায়গাটার দিকে বড় আর কালো কী একটা চোখে পড়ল, কানে এল ঢাক আর বাঁশির আওয়াজ। আমার হৃদয়ে তখনো সংগীতের ঝঙ্কার, মাঝে মাঝে মাজুরকার রেশ ভেসে আসছে। কিন্তু এটা যেন অন্য ধরনের বাজনা, নিষ্ঠুর অসুন্দর।

'কী ব্যাপারটা', ভাবতে ভাবতে মাঠ চিরে যাওয়া গাড়ির পেছল রাস্তা হয়ে চললাম সেদিকে যেদিকে আওয়াজ। প্রায় একশ গজ গিয়ে কুয়াশায় লোকের কালো ভিড়টা স্পষ্ট হতে শুরু করল। সৈন্য নিশ্চয়। কুচকাওয়াজ চলেছে ভেবে

একটি কামারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চললাম, তার গায়ে তেলচিটে জ্যাকেট আর অ্যাপ্রন, বড় একটা বান্ডিল হাতে। কালো কোট পরে দু-সারি সৈন্য মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, বন্দুকগুলো পাশে ধরা। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁশি-বাজিয়ে আর ঢাকীরা বারবার বাজিয়ে চলেছে অপ্রীতিকর কর্কশ সুরটা।

'কী করছে ওরা?' দাঁড়িয়ে পড়ে কামারটিকে জিগ্যেস করলাম।

'কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল বলে একটা তাতারকে শাস্তি দিচ্ছে', সৈন্যদের দু-সারির একেবারে শেষের দিকটায় তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিল কামার।

'সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম বীভৎস কী একটা দু-সারির মাঝখান দিয়ে আসছে আমার দিকে। কোমর অবধি খালি গা, দু বন্দুকে বাঁধা একটি লোক, বন্দুকগুলো ধরেছে দুটি হাবিলদার, তাড়িয়ে আনছে তাকে। পাশে পাশে হাঁটছেন ফৌজি কোট আর ফৌজি টুপি পরা দীর্ঘাকৃতি একটি অফিসার, চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকল। সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কেঁপে গলন্ত বরফে থসথস করে পা ফেলে বন্দিটি এগিয়ে আসছে, দুধার থেকে তার ওপরে পড়ছে মারের পর মার, থেকে থেকে সে নিচু হয়ে পিছিয়ে পড়লে বন্দুকধরা হাবিলদার দুটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কখনো-বা ঢলে একটু বেশি এগিয়ে পড়লে সৈনিকেরা ঝটকা দিয়ে টেনে নিচ্ছে যাতে পড়ে না যায়। আর তার পাশে সমানে দৃঢ়পায়ে হাঁটছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি, পিছিয়ে পড়ছেন না একবারও। তিনি হলেন ভারেঙ্কার বাবা, টকটকে লাল মুখ, সাদা গোঁফ আর জুলফি।

'লাঠি পড়াতে প্রত্যেকবার বন্দিটি যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ ফিরিয়ে যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে যেদিক থেকে আঘাত আসছে, ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে কী একটা বলে চলেছে বারবার। কাছে না আসা পর্যন্ত কী বলছে বুঝতে পারিনি। সেটা বলা নয় ঠিক, কান্না। 'দয়া করো, ভাইসব! দয়া করো ভাইসব!' কিন্তু কোনো দয়া নেই ভাইদের; মিছিলটা ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল, দেখলাম আমার সামনেকার সৈন্যটি দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এসে এত জোরে মারল তাতারটির পিঠে যে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল বেতটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, সৈনিকেরা টেনে ধরে রাখল, ও পাশ থেকেও একই রকম আঘাত এল, এ পাশ থেকে আবার, আবার ও পাশ থেকে ... তাল ঠুকে তার পাশে চলেছেন কর্নেল, কখনো তাকাচ্ছেন নিজের পায়ের দিকে, কখনো-বা বন্দিটির দিকে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম মিছিলটা সেখানটা পেরিয়ে যাবার সময়ে দু-সারি সৈন্যর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বন্দির পিঠের আভাস। দাগড়া দাগড়া ভেজা লাল অস্বাভাবিক একটা পিঠ। মানুষের দেহ বলে বিশ্বাস হল না।

'হে ভগবান', পাশের কামারটি বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে।

'এগিয়ে গেল মিছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়া আঁকুপাঁকু মানুষটির ওপর দুধার থেকে সমানে চলল মারের পর মার। সমানে ঢাকের বাজনা, বাঁশির আওয়াজ, বন্দির পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে সমানে এগিয়ে চললেন দীর্ঘাকৃতি জমকালো অফিসারটি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে, তারপর দ্রুতপায়ে তিনি গেলেন একটি সৈনিকের কাছে।

'ফাঁকি দিবি আর? দেখাচ্ছি তোকে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'দিবি ফাঁকি?' দেখলাম সোয়েডের দস্তানা পরা বলিষ্ঠ হাতে তিনি কষে একটা চড় বসালেন ছোটখাটো ভীত দুর্বল সৈনিকটির মুখে, তাতারের দগদগে লাল পিঠে যথেষ্ট জোরে সে বেত চালায়নি বলে।

'লেআও নয়া বেত!' হাঁকলেন কর্নেল। তাকাতেই দেখতে পেলেন আমাকে। চিনতে না পারার ভান করে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বদরাগী একটা ভ্রুকুটি টেনে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন। এত লজ্জা হল আমার যে কোন্‌দিকে তাকাব ভেবে পেলাম না, যেন অত্যন্ত জঘন্য একটা অপরাধে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চললাম বাড়িমুখো। সারাপথ কানে বাজতে লাগল ঢাকের শব্দ, বাঁশির চিৎকার, সেই কথাগুলো : 'দয়া করো, ভাইসব', কর্নেলের ক্রুদ্ধ রোয়াব ভরা হাঁক : 'ফাঁকি দিবি আবার!' আর বুকের ভেতরটায় প্রায় শারীরিক গা ঘুলিয়ে ওঠার মতো এমন একটা কষ্ট হল, কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল রাস্তায়। মনে হল দৃশ্যটির সমস্ত বিভীষিকা উদগার করে ফেলতে হবে আমায়। কী করে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম মনে নেই, কিন্তু ঘুম আসতে-না-আসতে আবার সবকিছু ফিরে এল চোখের সামনে, বেজে উঠল কানে। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

'কর্নেল সম্পর্কে মনে মনে হল, ওঁর নিশ্চয়ই এমন একটা যুক্তি আছে যেটা আমার জানা নেই। উনি যা জানেন আমার জানা থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, যা দেখলাম তাতে এত কষ্ট হত না।' কিন্তু শত ভেবেও কর্নেলের জানা জিনিসটি কী মাথায় ঢুকল না, ঘুম এল না সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর তা-ও এল একটি বন্ধুর ওখানে গিয়ে প্রচুর মদ্যপানের পর।

'আপনারা ভাবছেন যে দৃশ্যটি দেখি সেটি মন্দ বলে ধরে নিয়েছিলাম! মোটেই নয়। "ব্যাপারটা যখন এত নিশ্চিন্তভাবে করা হয়ে থাকে, লোকে যখন সেটাকে দরকার বলে মেনে নিয়েছে তখন তার মানে ওদের নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা যুক্তি আছে সেটা আমার অজানা", এই ভেবে সেটা কী বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বের করতে পারিনি কখনো। আর পারিনি বলে আমার পূর্বেকার সংকল্পমতো সামরিক কাজে যোগ দিতে পারিনি। শুধু যে সামরিক কাজে যোগ দিতে পারিনি তা নয়, কোনো কাজেই নয়, আর দেখতেই তো পারছেন কিছুরই যোগ্যতা আমার নেই।'

'আপনি যে কেমন অযোগ্য সেটা ভালো করে আমাদের জানা আছে', অতিথিদের একজন বললেন। 'আপনি না থাকলে কত লোক যে কী অযোগ্য হয়ে থাকত সেটা বরং ভেবে দেখুন।'

'যতসব বাজে কথা।' আন্তরিক বিরক্তির সঙ্গে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

'আচ্ছা, প্রেমের কী হল?' আমরা প্রশ্ন করলাম।

'প্রেম? সেদিন থেকে উবে গেল প্রেম। যখনি ভারেঙ্কা অভ্যেসমতো মৃদু হেসে অন্যমনা হয়ে যেত তখনি মাঠে কর্নেলের কথাটা মনে না করে পারতাম না, কেমন যেন অস্বস্তি আর বিশ্রী লাগত; দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দিতে লাগলাম। প্রেমও খতম হয়ে গেল। তাহলে দেখছেন তো কী না ঘটে, কোথা থেকে মানুষের গোটা জীবনটায় পরিবর্তন এসে মোড় ঘুরে যায়। আর আপনারা কিনা বলছেন ...' উপসংহার করলেন তিনি।

ইয়াসনায়া পলিয়ানা
২০ আগস্ট, ১৯০৩

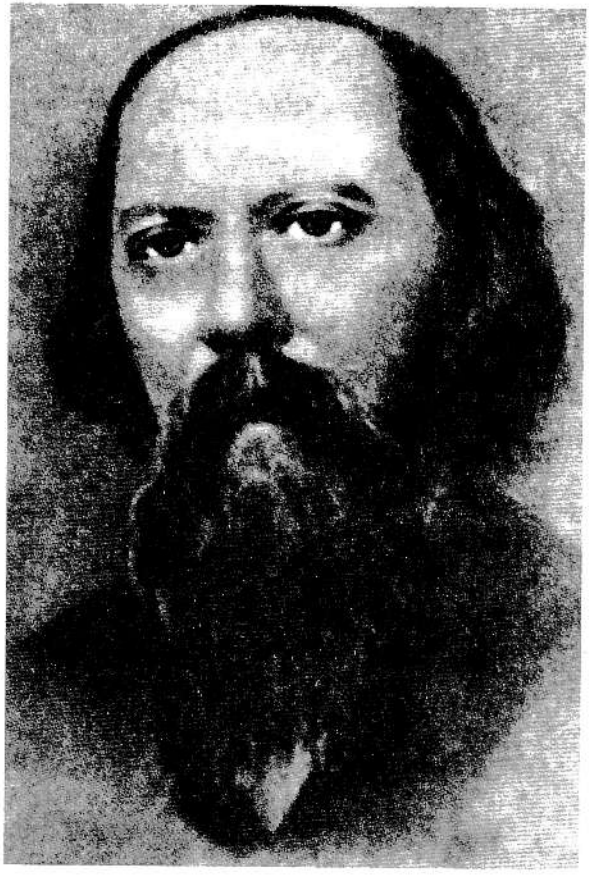

সালতি কভশ্চেদ্রিন মিখাইল ইয়েভগ্রাফভিচ (১৮২৬-১৮৮৯) — বিশ্বসাহিত্যের একজন মহান ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক, ৬০-এর দশকের রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রের একজন প্রতিনিধি। 'গলোভ্লেভ মহাশয়েরা', 'একটি শহরের কাহিনী', 'হবুচন্দ্রের আমল' ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে শ্চেদ্রিনের 'কাহিনী' (৮০-র দশক) নামক ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলোও অতি সুপরিচিত; 'দুই হুজুর ও এক চাষার কাহিনী'টি এরই অন্তর্ভুক্ত।

মিখাইল সালতি কভশ্চেদ্রিন
দুই হুজুর ও এক চাষার কাহিনী

এক যে ছিল দুই হুজুর, দুটিরই বুদ্ধি কম থাকায় অল্পদিনের মধ্যে, লাগ ভেলকি লেগে যা, পৌঁছে গেলেন এক নির্জন দ্বীপে।

সারাজীবন এঁরা কাজ করেছেন কোনো এক দপ্তরে; সেখানেই জন্ম, সেখানেই শিক্ষাদীক্ষা, সেখানেই কাজকর্ম সুতরাং কোনোকিছুই বোঝেননি। এমনকি কোনো কথাও বিশেষ জানতেন না কেবল একটি বুলি ছাড়া : 'যথাবিহিত আনুগত্য ও সম্মানপুরঃসর নিবেদনান্তে'।

নিষ্প্রয়োজন বোধে দপ্তরটি তুলে দেওয়া হল, হুজুররা খালাস পেলেন। চাকরি যাবার পর তাঁরা বাসা নিলেন পিটার্সবুর্গ শহরের পদইয়াচেস্কায়া রাস্তার নানান ফ্ল্যাটে; দুজনেরই ছিল নিজের নিজের রাঁধুনি, দুজনেই পেনশন পেতেন। আর হঠাৎ কিনা তাঁরা এসে হাজির হলেন এক নির্জন দ্বীপে; ঘুম ভেঙে দেখেন— দুজনেই শুয়ে আছেন একই কম্বল জড়িয়ে। বলাই বাহুল্য, প্রথমটা কিছুই তাঁরা টের পাননি, আলাপ শুরু করলেন এমনভাবে যেন কিছুই হয়নি।

'অবাক কাণ্ড স্যার, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি', বললেন একজন হুজুর, 'দেখছি যেন আছি এক নির্জন দ্বীপে...'

বলেই লাফিয়ে উঠলেন। লাফিয়ে উঠলেন অপর হুজুরটিও।

'কী কাণ্ড! ব্যাপার কী? আছি কোথায়?' একবাক্যে বলে উঠলেন দুজনেই।

পরস্পরকে ছুঁয়েটুয়ে দেখলেন সত্যিই স্বপ্ন কিনা, সত্যিই ভারি বিদঘুটে মতিভ্রম বটে! কিন্তু ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের বেশি কিছু নয় এই বলে নিজেদের বোঝাবার যতই চেষ্টা করুন, শেষপর্যন্ত শোচনীয় বাস্তবটা না মেনে উপায় রইল না।

সামনে তাঁদের একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে খানিকটা মাটি, তারপর ফের সেই অকূল সাগর। দপ্তর বন্ধ হবার পর এই প্রথম আবার কাঁদলেন হুজুররা।

দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে দেখলেন, দুজনেরই গায়ে শোবার পোশাক, আর গলায় একটি করে মেডেল।

'এখন একটু কফি পেলে হত', বললেন একজন হুজুর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটেছে তাঁদের কপালে, ফলে দ্বিতীয়বার কাঁদলেন।

কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'একা একা এখন করি কী? নয় একটা আর্জিই লেখা গেল, কিন্তু কী ফল হবে?'

অপর জন বললেন, 'শুনুন বলি, আপনি স্যার পুবদিকে চলে যান, আমি যাই পশ্চিমে, সন্ধ্যাবেলায় ফের এইখানে মিলব। বলা যায় না, কিছু একটা মিলে যেতেও পারে।'

খোঁজা শুরু হল কোন্‌টা পুব, কোন্‌টা পশ্চিম। মনে পড়ে গেল বড়কর্তা একদিন বলেছিলেন : কোন্‌টা পুবদিক বার করতে হলে উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়াবে, ডানহাতের দিকটা পুবদিক। তাই উত্তরদিক খোঁজা শুরু হল; এদিকে দাঁড়ান, ওদিকে দাঁড়ান, চতুর্দিক ঘুরে দেখেন, কিন্তু সারাজীবন দপ্তরে কাজ করেছেন কিনা, তাই কিছুই ফলোদয় হল না।

একজন হুজুর দপ্তর ছাড়াও নগরসৈন্যদের ইশকুলে হস্তলিপির মাস্টারি করেছেন, সুতরাং কিছু বেশি বুদ্ধি ধরতেন। তিনি বললেন, 'তারচেয়ে বরং স্যার, আপনি যান ডান দিকে, আমি বাঁ দিকে; সেই ভালো।'

যা বলা হল তাই করা হল। এক হুজুর গেলেন ডান দিকে, দেখেন— গাছ, গাছে কতরকম সব ফল। হুজুরের ইচ্ছে হয় অন্তত একটা ফলও যদি পাড়া যায়, কিন্তু সব ফলই এত উঁচুতে যে গাছে উঠতে হয়। ওঠার চেষ্টা করেও দেখলেন, কিন্তু কিছুই হল না, জামাটি কেবল ছিঁড়ে গেল। নদীর কাছে গেলেন হুজুর, দেখেন মাছ কী, যেন ফন্তানকা রাস্তার মেছোবাজারের মতো গিজগিজ করছে।

'আমাদের পদইয়াচেস্কায়ার বাড়িতে এ মাছ পেলে হত!' মনে মনে ভাবলেন হুজুর, ক্ষুধাবোধে মুখখানা পর্যন্ত বদলে গেল।

বনে ঢুকলেন হুজুর, বনমুগরগি ডেকে ওঠে, তিতির ডেকে ওঠে, ছুটে পালায় খরগোশ।

'বাপস্— খাবার কত!' বললেন হুজুর, টের পাচ্ছিলেন ইতিমধ্যেই পেটে খিল ধরতে শুরু করেছে।

কিন্তু করবার কিছু নেই, খালিহাতেই যথাস্থানে ফিরতে হল। ফিরে দেখেন অপরজন আগেই এসে তাঁর অপেক্ষায় আছেন।

'তা স্যার, কিছু উপায় পেলেন?'

'পেলাম আর কী, এই 'মস্কো সংবাদের' একটা পুরনো সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই না।'

হুজুররা ফের শয়ন করলেন, কিন্তু খিদেয় ঘুম আর আসে না। কখনো এই ভেবে অস্থির হন, পেনশনের টাকাটা কে সই করে নেবে, কখনো দিবাস্বপ্ন দেখেন ফল, মাছ, বনমুরগি, তিতির, খরগোশ।

'কে ভেবেছিল স্যার, মানুষের খাদ্য কিনা তার আদিমরূপে উড়ছে, জলে ভাসছে, ডালে ঝুলছে' বললেন একজন।

'তা বটে', বললেন অপরজন. 'না মেনে উপায় নেই অথচ আমি এতদিন ভেবে এসেছি, সকালের কফির সঙ্গে যে বনরুটিটি খাই, সেটি বুঝি ঠিক অমনি রুটি হয়েই জন্মায়।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ধরুন, কেউ যদি পাখি খেতে চায় তবে প্রথমে সেটাকে ধরতে হবে, মারতে হবে, ছাল ছাড়াতে হবে, রোস্ট করতে হবে ... কিন্তু এসব করে কী করে?'

'এসব করে কী করে?' প্রতিধ্বনির মতো পুনরাবৃত্তি করলেন অপরজন।

তারপর চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খিদের চোটে কিছুতেই ঘুম এল না। চোখের সামনে কেবলি ভেসে ওঠে বনমুরগি, টার্কি, শুয়োরছানা— সরসপক্ব, ঈষৎ রক্তিমাভ, সেইসঙ্গে শসা, ভিনিগারে জারানো শবজি আর নানা রকম স্যালাড।

'এখন ইচ্ছে হচ্ছে যেন আমার বুটজুতোটাই খাই!' বললেন একজন।

'অনেকদিনের ব্যবহারে নরম হয়ে আসা দস্তানাজোড়াও মন্দ হবে না।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরজন।

হঠাৎ দুই হুজুরই তাকালেন পরস্পরের দিকে : চোখে তাঁদের হিংস্র ঝলক, দাঁত কড়মড় করে উঠল, বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কেমন চাপা গর্জন। ধীরে ধীরে পরস্পর কাছিয়ে এলেন তাঁরা, তারপর চোখের পলকে ফুঁসে উঠলেন। শুরু হয়ে গেল চুলোচুলি, হাঁউমাউ, হাঁসফাঁস। যে হুজুরটি হস্তলিপির মাস্টারি করেছিলেন, তিনি সঙ্গীর মেডেলে কামড় বসিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটি গিলে ফেললেন। কিন্তু রক্তপাত হতে দেখে দুজনেরই যেন সম্বিত ফিরল।

'ভগবান রক্ষা করুন!' সমস্বরে বলে উঠলেন দুজনে, 'এমন করে যে আমরা দুজন দুজনকেই খেয়ে বসব!'

'এখানে আমরা এসেই-বা পড়লাম কী করে? আমাদের সঙ্গে এমন ত্যাঁদড়ামি লাগিয়েছে কোন্ হারামজাদা!'

'আমাদের স্যার, কোনোরকম গল্পটল্প করে ভুলে থাকা দরকার, নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে', বললেন একজন হুজুর।

'শুরু করুন', বললেন অপরজন।

'যেমন ধরুন, এই যে সূর্য প্রথমে ওঠে, পরে অস্ত যায় সেটা কেন? প্রথমে অস্ত গিয়ে পরে উঠলেও তো পারত।'

'আপনি স্যার, অদ্ভুত লোক! আপনিও তো প্রথমে ঘুম থেকে ওঠেন, আপিস যান, কলম চালান, তারপর শুতে যান, তাই না?'

'কিন্তু ধরুন এই উল্টোটাই-বা কেন চলবে না : প্রথমে শুলাম, নানারকম স্বপ্ন দেখলাম, তারপর উঠলাম?'

'ইয়ে... মানে, কবুল করতেই হবে, আমি যখন আপিস করতাম তখন সর্বদাই ভাবতাম, এই এখন সকাল, তারপর দিন, তারপর রাতের খাওয়া, ব্যস ঘুম!'

কিন্তু খাওয়ার কথা মনে হতেই দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল, গল্প থেমে গেল শুরুতেই।

'এক ডাক্তারের কাছে শুনেছিলাম, মানুষ নিজের দেহরস শুষেই অনেকদিন টিকে থাকতে পারে।' ফের শুরু করল একজন।

'সে কী!'

'তাই। নিজের দেহরস যেন অন্য কী একটা রস তৈরি করে, সেটা থেকে আবার অন্য একটা, এমনিই চলবে যতক্ষণ দেহরস একেবারেই ফুরিয়ে না যায়।'

'আর ফুরিয়ে গেলে?'

'তখন খাবারদাবারের মতো কিছু একটা চাই...'

'ফুঃ!'

মোট কথা, যে বিষয় নিয়েই আলাপ শুরু হোক-না কেন, সেটা নির্ঘাত এসে পৌঁছত খাবার কথায়, এবং তাতে আরো জ্বলে উঠত খিদে। ঠিক হল, আলাপ বন্ধ থাক। 'মস্কো সংবাদের' যে সংখ্যাটা পাওয়া গেছে সেটার কথা মনে পড়ায় সাগ্রহে সেইটেই পড়া শুরু হল।

আলোড়িত কণ্ঠে একজন হুজুর পড়লেন, 'কাল আমাদের এই প্রাচীন রাজধানীর মহামান্য নগরপালের গৃহে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের সাড়ম্বর আয়োজন হয়। টেবিলে পরিবেশিত হয় শত ব্যক্তির জন্য অপরূপ সুস্বাদু ব্যঞ্জন। সমস্ত দেশের সেরা ভোগ্যের যেন মিলন হয় এই মোহময় উৎসবে। ছিল সেক্সনা নদীর 'সোনালি স্টার্জন' মাছ, ককেসাসের অরণ্যে লালিত ফ্যাজন্ট পাখি এবং আমাদের উত্তরাঞ্চলের ফেব্রুয়ারি মাসের পক্ষে অতি বিরল বেরি...'

'উহ ভগবান! সত্যিই স্যার, অন্য কোনো বিষয় কি আর পেলেন না?' হতাশায় চিৎকার করে অন্য হুজুর পত্রিকাটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'তুলা নগর থেকে প্রেরিত : গতকাল উপা নদীতে দৈবাৎ স্টার্জন মাছ ধরা পড়ায় (এমন ঘটনা এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরাও কেউ মনে করতে পারেন

না, তার ওপর মাছটির চেহারা একেবারে স্বয়ং পুলিশকর্তা ব... এর মতো) স্থানীয় ক্লাবে উৎসব হয়। উৎসবের উপলক্ষটিকে নিয়ে আসা হয় মস্ত এক কাঠের রেকাবে, তার উপর শসা ছড়ানো, মুখের মধ্যে কাঁচা সবজি। ডা. প.... ছিলেন এদিনকার ডিউটিতে, তিনি নজর রাখেন যাতে অভ্যাগতরা সকলেই একটুকরো করে পান, ঝোলটা হয় অতি বিচিত্র, প্রায় অপরূপ....'

'মাপ করবেন স্যার, পাঠ্যাংশ নির্বাচনে আপনিও দেখছি খুব সতর্ক নন', প্রথম হুজুর থামিয়ে দিয়ে কাগজটা নিয়ে নিজে পড়তে লাগলেন :

'ভিয়াৎকা থেকে প্রেরিত : এখানকার সাবেকি বাসিন্দাদের একজন মাছের ঝোল বানাবার এক মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। জ্যান্ত মাছটাকে আগে পিটতে হবে। যখন শোকে দুঃখে মাছের মেটে ফুলে উঠবে ....'

হুজুররা মাথা হেঁট করলেন। যেদিকেই চোখ ফেরালে সেখানেই খাবার কথা। তাঁদের নিজেদের ভাবনাই চক্রান্ত চালাল তাঁদেরই বিরুদ্ধে, কেননা বিফ্‌স্টিক জাতীয় দ্রব্যের ধারণা তাঁরা যতই মাথা থেকে দূর করতে চাইলেন ততই জোর করে সেগুলো যেন চেপে বসতে লাগল।

যে হুজুরটি হস্তলিপির মাস্টারি করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা প্রেরণা জোগাল .... খুশি হয়ে বললেন, 'আচ্ছা স্যার, একটা চাষাকে জোটালে হয় না?'

'কী বলছেন, মানে .... চাষি?'

'আজ্ঞে হাঁ, সাধারণ চাষি... সাদামাটা চাষি যেমন হয়! সে আমাদের রুটি বানিয়ে দিতে পারে, মুরগি মাছ ধরতে পারে!'

'হুম.... চাষা.. কিন্তু তাকে পাব কোথায়, আপনার এই চাষাকে, নেই যে?'

'চাষা নেই মানে, চাষা সর্বত্রই আছে, খুঁজলেই বেরুবে। সম্ভবত লুকিয়ে আছে কোথাও, কাজে ফাঁকি দিচ্ছে!'

মতলবটা হুজুরদের এতই ভালো লাগল যে পড়িমরি লাফিয়ে উঠে চাষা খুঁজতে বেরলেন তাঁরা।

অনেকক্ষণ তাঁরা বৃথাই ঢুঁড়ে বেড়ালেন দ্বীপটা, কিন্তু শেষপর্যন্ত গম ঝাড়াইয়ের চড়া সুবাস আর মেষচর্মের কটু গন্ধে সন্ধান পেয়ে গেলেন। গাছের তলায় হাতে মাথা রেখে চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে এক দশাসই চেহারার চাষা, কাজ ফাঁকি দিচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত বেহায়ার মতো। হুজুরদের রাগের আর সীমা রইল না।

'ঘুমুচ্ছিস ব্যাটা!' দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর, একেবারে খেয়ালই নেই যে দুজন হুজুর আজ দুদিন ধরে না খেয়ে আছেন! 'এক্ষুনি কাজে লেগে পড় বলছি!'

চাষা চোখ মেলে দেখে, হুজুরদুটি কড়া লোক। ইচ্ছে হল চম্পট দেয় কিন্তু হুজুররা তাকে আঁকড়িয়ে একেবারে ঠেসে ধরেছিলেন।

কাজেই লেগে গেল সে।

পড়িমরি গাছে উঠল, গোটা দশেক করে পাকা পাকা আপেল পেড়ে দিল হুজুরদের, আর নিজে নিল মাত্র একটি, টক মতো। তারপর মাটি খুঁড়ে আলু তুলল; দুটুকরো কাঠ ঘসে ঘসে আগুন জ্বালাল। নিজের মাথার চুল দিয়েই জাল বানিয়ে বনমুরগি ধরল। তারপর আগুন উসকিয়ে এতই সব নানাবিধ খাদ্য বানাল যে হুজুরদেরও মনে হল : ফাঁকিবাজটাকেও খানিকটা দেবে নাকি?

চাষাড়ে এই আয়োজনের দিকে চেয়ে হুজুরদের বুক আনন্দে দুলে উঠল। একেবারেই ভুলে গেলেন যে কাল খিদেয় প্রায় মরতে বসেছিলেন; ভাবলেন : দ্যাখো, হুজুর হওয়ার সুবিধা কত! কোথাও বিপদে পড়তে হয় না!

'তা হুজুরদের তৃপ্তি হল তো বাবু?' জিগ্যেস করল সেই চাষা ব্যাটা।

'তৃপ্তি করেই খেলাম ভায়া, খুব খেটেছিস বটে', বললেন হুজুররা।

'তাহলে এখন একটু জিরিয়ে নেব হুজুর?'

'তা জিরিয়ে নিস, তবে তার আগে একটু দড়ি পাকিয়ে দে।'

চাষাও অমনি বুনোলতা জোগাড় করতে লেগে গেল, জলে ভেজাল, ঝাড়ল, থেঁতলাল— সন্ধ্যার দিকে তৈরি হয়ে গেল দড়ি। দড়ি দিয়ে হুজুররা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন চাষাকে, যেন না পালায়, নিজেরা শুলেন।

একদিন যায়, দুইদিন যায়; লোকটা এমনই পটু যে শূন্যি ভাঁড়ারেও সে রাজভোগ বানায়। হুজুরদের মুখে হাসি ফুটল, পেট ভরল, গা হল থলথলে, রঙ হল ফরসা। বলাবলি করেন, এই তো দিব্যি এখনো সবকিছু হাতের কাছে তৈরি, ওদিকে পিটার্সবুর্গে পেনশনের টাকাটাও বেশ জমছে।

'আচ্ছা আপনি কি ভাবেন স্যার, সত্যিই কি ব্যাবিলনের ভাষাবিভ্রাট ব্যাপারটা ঘটেছিল নাকি সবই একটা আষাঢ়ে গল্প?' প্রাতরাশ খেতে খেতে এক হুজুর বললেন আরেকজনকে।

'আমার ধারণা স্যার, সত্যিই ঘটেছিল, নইলে দুনিয়ায় যে এত নানান ভাষা সেটা এল কোত্থেকে!'

'তার মানে সেই মহাবন্যাও ঘটেছিল?'

'মহাবন্যাও ঘটেছিল বৈকি, নইলে বন্যার আগেকার যেসব জন্তু-জানোয়ার থেকে গেছে সেটার ব্যাখ্যা কী? এই তো 'মস্কো সংবাদে' লিখেছে...'

'মস্কো সংবাদটা'ই পড়া যাক, কী বলেন?'

সংখ্যাটা খুঁজে বার করে ছায়ায় বসে আদ্যোপান্ত পড়া হল, কীভাবে ভোজ হয়েছে মস্কোয়, ভোজ হয়েছে তুলায়, ভোজ হয়েছে পেনজায়, ভোজ হয়েছে রিয়াজানে— এবং মোটেই পেটের ভিতরটা ঘুলিয়ে উঠল না!

*　　*　　*

দিন যায়, দিন যায়, শেষপর্যন্ত মন খারাপ হতে লাগল হুজুরদের। পিটার্সবুর্গে ছেড়ে আসা রাঁধুনি দুটির কথা তাঁদের মনে হতে লাগল ঘন ঘন, বলতে কী চুপিসারে খানিকটা কেঁদেও নিলেন।

'পদইয়াচেস্কায়ার বাড়িতে এখন কী হচ্ছে বলুন তো স্যার?' একজন হুজুর জিগ্যেস করেন।

'আর বলবেন না স্যার, বুকখানা একেবারে মুচড়ে উঠছে!' জবাব দেন অন্যজন।

'এখানে সবই দিব্যি কাটছে, বলবার কিছু নেই। তবে কী জানেন, মাদী ছাড়া মর্দা— কেমন ইয়ে আর কী! তাছাড়া আপিসের চোগা চাপকানের কথাটা ভেবেও ভারি মন খারাপ লাগে!'

'মন খারাপ আবার নয়! বিশেষ করে পয়লা নম্বরের কাট, শুধু সেলাইটা দেখলেই মাথা ঘুরে যায়!'

চাষাটাকেই চেপে ধরলেন ওঁরা : 'দিয়ে আয় বাপু, দিয়ে আয় আমাদের পদইয়াচেস্কায়ার বাড়িতে!' আর অবাক কাণ্ড! দেখা গেল চাষা তাঁদের পদইয়াচেস্কায়া রাস্তাটাও চেনে। সে-ও যে ছিল বটে, মধু তুলেছে ঠোঁটে, দেখেছে গোঁপে চেটে, যায়নি কিছু পেটে!

'আরে আমরা যে পদইয়াচেস্কায়ারই হুজুর!' খুশি হয়ে উঠলেন বাবুরা।

'আর আমি হুজুর, দেখেননি কখনো বাড়ির ভারায় লোক, দড়িবাঁধা মাচায় দাঁড়িয়ে দেয়ালে রং দিচ্ছে নয়তো চালের উপর মাছির মতো হাঁটছে— সে লোক তো হুজুর আমিই!' বলল চাষাটা।

চাষাও তাই আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল, কী করে খুশি করবে তার হুজুরদের, তার মতো একটা ফাঁকিবাজকে যাঁরা কৃতার্থ করে দিয়েছেন, তার চাষাড়ে মেহনতে নাক সিঁটকোননি। বানাল সে এক জাহাজ বলে জাহাজ, সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একেবারে পদইয়াচেস্কায়ায় পৌঁছে দেবার মতো এক অর্ণবপোত।

'তবে দেখিস ব্যাটা, ডুবিয়ে মারিস না', ঢেউয়ের দোলায় টলমলে ডিঙির দিকে চেয়ে বললেন হুজুররা।

'ভাববেন না হুজুর, এই তো আর প্রথম নয়, ও আমার দেখা আছে!' এই বলে চাষা যাত্রার তোড়জোড় করল।

রাজহাঁসের নরম পালক জোগাড় করে চাষা ডিঙির মেজেটা বিছিয়ে দিল। তারপর হুজুরদের শুইয়ে ক্রুশ করে দাঁড় বাইতে লাগল। যাত্রাপথে কত রকম ঝড়ঝাপটা দেখে হুজুরদের কীরকম ভয় হয়েছিল, ফাঁকিবাজির জন্য চাষিটাকে তাঁরা কত যে গালমন্দ করেছিলেন সেটা কলম দিয়ে লেখার নয়, রূপকথাতে বলার নয়। চাষি কেবলি দাঁড় টানে, আর হুজুরদের মাছ খাওয়ায়।

শেষপর্যন্ত এসে গেল নদী-মা নেভা, ইয়েকাতেরিনার নামকরা ক্যানেল, তারপর বড় পদইয়াচেস্কায়া! তাদের হুজুরদুটি কেমন পুষ্টতুষ্ট, চেকনাই, হাসিখুশি হয়ে ফিরছে দেখে অবাক হয়ে গালে হাত দিলে রাঁধুনিরা। কফি পান করলেন হুজুররা, সাদা রুটিতে কামড় দিলেন, চোগা চাপকান গায়ে চাপালেন। তারপর খাজাঞ্চিখানায় চলে গেলেন তাঁরা আর সেখান থেকে কত যে টাকা লুটলেন সেটাও রূপকথাতে বলার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়!

তবে চাষাটাকেও তাঁরা ভোলেননি, এক পেগ ভোদকা আর পাঁচটি আনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— যা ব্যাটা, ফুর্তি কর্ গে!

চেকভ আন্তন পাভলভিচ (১৮৬০-১৯০৪)— উনিশ শতকের শেষ দিককার এক শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার ও নাট্যকার, অভিনব শিল্প-পথিকৃৎ, ছোটগল্পে অদ্বিতীয়।

'সাহিত্যের শিক্ষক' (১৮৯৪) গল্পটি চেখভের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আন্তন চেখভ
সাহিত্যের শিক্ষক

১

কাঠের মেজের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল; আস্তাবল থেকে বার করা হল প্রথমে কালো কুচকুচে ঘোড়া কাউন্ট নুলিন, তারপর সাদা ঘোড়া ভেলিকান, তার পরে তার বোন মাইকাকে। সবকটিই চমৎকার, দামি ঘোড়া। ভেলিকানের পিঠে জিন পরিয়ে বুড়ো শেলেস্তভ তার মেয়ে মাশাকে বললেন :

'নে, ওঠ মারিয়া গদফ্রে, এ্যা-এ্যাই!'

মাশা শেলেস্তভাই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বয়স অবশ্যি আঠারো হয়ে গেছে কিন্তু তাকে খুকি ভাবার অভ্যেস এখনো কারো যায়নি। সবাই তাকে এখনো তার ছেলেবেলার আদুরে নামে ডাকে মান্যা বা মান্যুস্যা। একবার সার্কাস আসায় মেয়েটি খুব করে তা দেখতে থাকে। এর পর থেকে সবাই তাকে ডাকে মারিয়া গদফ্রে।

'এ্যা-এ্যাই!' ভেলিকানের পিঠে চেপে হর্ষের শব্দ করল মারিয়া।

তার দিদি ভারিয়া চাপল মাইকার পিঠে, নিকিতিন কাউন্ট নুলিনের পিঠে, অফিসাররা নিজের নিজের ঘোড়ায়; অফিসারদের সাদা উর্দি আর নারী-আরোহিণীদের কালো পোশাকে চিত্রবিচিত্র এক সুন্দর দীর্ঘ মিছিল আঙিনা ছেড়ে কদম বাড়াল।

নিকিতিনের চোখে পড়ল, ঘোড়ায় চেপে রাস্তায় এসে ওঠা পর্যন্ত মান্যুস্যা কেন জানি কেবল তার দিকেই নজর দিচ্ছে। মান্যুস্যা তার আর কাউন্ট নুলিনের দিকে উদ্বেগে চেয়ে বলল :

'সের্গেই ভাসিলিচ, আপনি ওটার কাঁড়া-লাগাম সবসময় টেনে রাখবেন কিন্তু, ভড়কে যেতে দেবেন না! ন্যাকামি লাগিয়েছে ঘোড়াটা।'

ভেলিকানের সঙ্গে কাউন্ট নুলিনের খুব ভাব বলেই কিনা কে জানে, নাকি এমনিই, দৈবাৎ, মান্যুস্যা আগের মতো আজও এই তৃতীয় দিন ঘোড়া হাঁকাল নিকিতিনের পাশাপাশি। আর নিকিতিন চেয়ে দেখল সাদা, সগর্ব ঘোড়াটির উপর তার হালকা সুঠাম দেহখানার দিকে, তার সূক্ষ্ম মুখরেখার দিকে, তার খাড়াই গোল টুপিটার দিকে, যেটা মোটেই তাকে মানাচ্ছে না, তার আসল বয়সের চেয়ে যেন বড় লাগে তাকে— চেয়ে দেখল আনন্দে, মমতায়, পুলকে, কথাগুলো তার কানে আসছিল, কিন্তু মনে পৌঁছচ্ছিল না, ভাবছিল :

'না, একেবারে ঠিক, ভগবানের কাছে শপথ করছি, লজ্জা করব না, সবকিছু আজ ওকে খোলসা করে বলব...'

সময়টা তখন সন্ধে সাতটা, যখন সাদা অ্যাকেসিয়া আর বেগুনি ভাওলেটের গন্ধ এমন ঘন হয়ে ছড়ায় যে মনে হয় যেন গাছগুলো তাদের নিজেদের গন্ধেই নিঝুম হয়ে এসেছে। নগরোদ্যানে বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পাথর-বাঁধা রাস্তায় খটখটিয়ে বাজছে ঘোড়ার খুর। চারিদিক থেকে শোনা যায় হাসি, কথাবার্তা, গেট খোলার শব্দ। চোখে পড়ে গেলে সৈন্যরা স্যালুট দিচ্ছিল অফিসারদের, ছাত্রেরা মাথা নোয়াচ্ছিল নিকিতিনের উদ্দেশে। বোঝা যাচ্ছিল, যারা বেড়াচ্ছে নগরদ্যোনের বাজনা শুনতে চলেছে, তাদের ভালোই লাগছিল এই মিছিলটাকে দেখতে। কী উষ্ণ চারিদিক, আকাশের এলোমেলো ভাসন্ত মেঘগুলো কী নরমই-না দেখতে, অ্যাকেসিয়া আর পপলার গাছের ছায়াগুলো কী মৃদু, কী নিবিড়— চওড়া রাস্তাটার সবখানি জুড়ে সে ছায়া অপর পারের বাড়িগুলোর দোতলার ঝুলবারান্দা পর্যন্ত বিলম্বিত হয়ে গেছে।

শহর পেরিয়ে বড় সড়ক ধরে ঘোড়া ছুটল। এখানে আর অ্যাকেসিয়া আর ভাওলেটের গন্ধ নেই, সংগীতের ঝঙ্কারও নেই, তার বদলে ক্ষেতের সুঘ্রাণ, সবুজ হয়ে উঠেছে কচি রাই আর গম, কিচকিচ করে ডাকছে সুসলিক, কা কা করছে কাক। যেদিকে চোখ যায় কেবলি সবুজ, শুধু মাঝে মাঝে কোথাও কালো হয়ে আছে সবজি ভুঁই, আর দূরে কবরখানার বাঁয়ে সাদা হয়ে আছে ঝরন্ত ফুলের একটা আপেলবীথি।

গেল তারা কসাইখানাটা পেরিয়ে, বিয়ার কারখানাটা পেরিয়ে, একদল বাজনদার সৈন্য যাচ্ছিল শহরতলির পার্কে, তাদেরও পেরিয়ে গেল।

'পলিয়ানস্কির ঘোড়াটা ভালো, তর্ক করার কিছু নেই', ভারিয়ার পাশে পাশে যাচ্ছিল যে অফিসারটি তার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে নিকিতিনকে বলল মান্যুস্যা, 'তবে খুঁত আছে। বাঁ পায়ের উপর ওই সাদা ছোপটা একেবারেই মানায় না, আর দেখুন না, মাথা ঝাঁকায় কেমন। এখন আর যতই শেখান, ফল কিছু হবে না, আমরণ অমনি মাথা ঝাঁকিয়েই যাবে।'

মান্যুস্যা ছিল ঠিক তার বাপের মতোই ঘোড়া-পাগল। কারো একটা ভালো ঘোড়া আছে দেখলে তার কষ্ট হত, পরের ঘোড়ার খুঁত বার করতে পারলে খুশি হয়ে উঠত সে। নিকিতিন কিন্তু ঘোড়ার কিছু বুঝত না, ঘোড়ার কাঁড়া টানা আর রাশ টানা, কদমে ছোটা কি দুলকি ছোটা সবই তার কাছে সমান; তার শুধু মনে হল যে ঘোড়ার উপর তার নিজের ভঙ্গিটা খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, কেমন টানটান হয়ে আছে, সুতরাং যে অফিসাররা জিনের উপর দিব্যি বসে থাকতে পারে মান্যুস্যার চোখে তাদের ভালো লাগার কথা। তাই অফিসারদের কথা ভেবে ঈর্ষা হল তার।

শহরতলীর পার্ক পেরিয়ে যখন সবাই যাচ্ছিল তখন কে যেন বলল, গিয়ে একটু সোডাজল খাওয়া যাক। পার্কে গেল সবাই। এখানে গাছ বলতে কেবলই ওক। পাতা ফুটতে শুরু করেছে সবে, ফলে কচিপাতার ঝালরের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল গোটা পার্কটা— তার নাট-মঞ্চ, টেবিল, নাগরদোলা, দেখা যাচ্ছিল কাকের বাসাগুলোও, ঠিক যেন ছোট ছোট টুপি। সওয়ার আর মহিলারা নেমে এসে ছুটল একটি টেবিলের কাছে, সোডাজল চাইল। পরিচিত যারা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এগিয়ে এল ওদের দিকে। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন সামরিক ডাক্তার, পায়ে খুব উঁচু উঁচু বুটজুতো আর একজন ব্যান্ডমাস্টার, নিজের বাজনাদারদের অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার নিশ্চয় নিকিতিনকে ভেবেছিলেন কলেজছাত্র, তাই জিগ্যেস করলেন :

'কলেজ ছুটিতে এসেছেন বুঝি?'

'না, আমি এখানেই বরাবর থাকি', নিকিতিন বলল, 'স্কুলে মাস্টারি করি।'

'তাই নাকি?' অবাক হলেন ডাক্তার, 'এত কম বয়স, ইতিমধ্যেই মাস্টারি করছেন?'

'কম কোথায়? তা ভগবানের দয়ায় ২৬ বছর...'

'আপনার গোঁপ-দাড়ি, আপনার সমস্ত চেহারা দেখে কিছুতেই ২২-২৩-এর বেশি মনে হয় না। আশ্চর্য!'

নিকিতিন ভাবল, 'যত সব! এটাও দেখছি আমায় দুগ্ধপোষ্য ভেবেছে!'

ওর তারুণ্যের কথা তুললে, বিশেষ করে মহিলা বা ছাত্রদের সামনে— ওর অসাধারণ খারাপ লাগত। শহরটায় এসে যবে থেকে সে এখানে কাজ নিয়েছে, তখন থেকে সে তার তারুণ্যকে বিদ্বেষের চোখে দেখতে শুরু করেছে। স্কুলের ছাত্ররা তাকে ভয় পায় না, বুড়োরা তাকে ডাকে ছোকরা বলে, মেয়েরা তার দীর্ঘ আলোচনা শোনার বদলে তার সঙ্গে নাচতেই বেশি ইচ্ছুক, কোনো উপায়ে আরো বছর দশেক বুড়োতে পারলে সে খুশি হয়েই সে উপায় অবলম্বনে রাজি।

পার্ক থেকে তারা গেল আরো এগিয়ে শেলেস্তভদের খামারে। এখানে ফটকের কাছে থেমে গোমস্তার বউ প্রাস্কভিয়াকে ডেকে পাঠানো হল, টাটকা দোয়া ধারোষ্ণ দুধ আনতে বলা হল তাকে। দুধ অবশ্য কেউ খেল না, সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি

করল, হাসাহাসি করল, তারপর ফিরে গেল। যখন ফিরছে তখন শহরতলীর পার্কে বাজনা শুরু হয়ে গেছে; সূর্য নেমেছে কবরখানার আড়ালে, গোধূলির আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে আধখানা আকাশ।

এবারেও মান্যুস্যা যাচ্ছিল নিকিতিনের পাশে পাশে। নিকিতিনের ইচ্ছে হল বলে কী ভীষণ সে তাকে ভালোবাসে, কিন্তু ভয় হল কথাটা অফিসারদের কানে যাবে, ভারিয়ার কানে যাবে। তাই চুপ করে রইল। মান্যুস্যাও কথা বলল না; নিকিতিন টের পেল কেন সে চুপ করে আছে, চুপ করে তারই পাশাপাশি চলেছে। আনন্দে তার বুক ভরে গেল, মাটি, আকাশ, শহরের আলো, বিয়ার কারখানার কালো সিল্যুয়েট— সবকিছুই যেন তার চোখে গলে গিয়ে পরিণত হল ভারি সুন্দর, ভারি আদরের কী একটা বস্তুতে, মনে হল তার কাউন্ট নুলিন যেন বাতাসে উড়ছে, উঠে যেতে চাইছে ওই রক্তিম আকাশটা বেয়ে।

ঘরে ফিরল সবাই। বাগানের মধ্যে টেবিলের উপর সামোভারে জল ফুটছে, টেবিলের এককোণে নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে, সদর আদালতের কর্মচারীদের নিয়ে বসে আছেন বুড়ো শেলেস্তভ, বরাবরের মতোই কী একটা বিষয় নিয়ে সমালোচনা করছেন।

বলছিলেন, 'এ হল পেজোমি! পেজোমি ছাড়া কিস্যু নয়। একেবারে পেজোমি!'

যেদিন থেকে মান্যুস্যাকে ভালোবেসেছে নিকিতিন সেদিন থেকে শেলেস্তভদের বাড়ির সবকিছুই তার ভালো লাগছে : বাড়িটা, বাড়ির সামনের বাগানটা, সন্ধ্যায় চা, বেতের চেয়ারগুলো, বুড়ি আয়া, এমনকি এই 'পেজোমি' কথাটা পর্যন্ত, বুড়ো যেটা প্রায়ই আওড়াতে ভালোবাসতেন। ভালো লাগত না শুধু কুকুর-বেড়ালের প্রাচুর্য, আর মিশরি পায়রা, বারান্দায় মস্ত এক খাঁচায় সেগুলো একঘেয়ে বকম-বকম করে যেত। শৌখিন আদুরে কুকুর আর বেজাতে কুকুর সংখ্যায় এত যে শেলেস্তভদের সঙ্গে এতদিনের পরিচয়েও সে শুধু দুটিকে মাত্র চিনে উঠতে পেরেছে : মুশকা আর সোম। মুশকা হল একটা ছোট্ট রোঁয়া ওঠা কুকুর, মুখটা লোমে ভরা, ভারি খেঁকুরে আর আদুরে। নিকিতিনকে একেবারেই দেখতে পারত না। দেখলেই মাথাটা একদিকে বেঁকিয়ে দাঁত দেখাত, ফুঁসত : 'গররররর... গাঁ গাঁ গাঁ ... গরর!' তারপর গিয়ে সেঁধত চেয়ারের তলায়। চেয়ারের তলা থেকে কুকুরটাকে ভাগাবার চেষ্টা করায় কুকুরটা একেবারে কর্ণভেদী ডাক ছাড়ত, আর মনিবরা সবাই বলে উঠতেন :

'ভয় নেই, ভয় পাবেন না, কামড়াবে না, কুকুরটি আমাদের ভারি লক্ষ্মী।'

সোমটা হল এক প্রকাণ্ড কেলে মদ্দা কুকুর, লম্বা লম্বা ঠ্যাং, লাঠির মতো শক্ত একটা লেজ। দুপুরের খাওয়া আর সন্ধ্যার চায়ের সময় সাধারণত নীরবে ঘোরাফেরা করত টেবিলের নিচে, লোকের জুতোয় আর টেবিলের পায়ায় লেজের বাড়ি মারত। বোকা সোকা, ভালোমেজাজি কুকুর, কিন্তু নিকিতিন তাকে সইতে

পারত না এইজন্যে যে কুকুরটার অভ্যেস ছিল খাবার সময় এসে হাঁটুতে মুখ গুঁজবে, মুখের লালায় ট্রাউজারটি ভেজাবে। নিকিতিন একাধিকবার তার টিপ কপালে ছুরির বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে দেখেছে, নাকের উপর টোকা মেরেছে, ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কিন্তু ট্রাউজারের দাগ পড়া থেকে কিছুতেই রেহাই পায়নি।

অশ্বারোহণের পর চা, জ্যাম, মচমচে রুটি আর মাখনটা মনে হল ভারি মিঠে। চায়ের প্রথম গেলাশটা সবাই খেল ভারি তৃষ্ণা নিয়ে, নীরবে; দ্বিতীয় গেলাশের সময় শুরু হয়ে গেল তর্ক।

চায়ের পর আর দুপুরের খাবারের সময় প্রতিবারই তর্কটা শুরু করে ভারিয়া। বয়স তার তেইশ, দেখতে ভালোই, মান্যুস্যার চেয়ে সুন্দরী, সংসারের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা বলে ধরা হত, নিজেও সে চলত কড়া ভারিক্কি চালে, লোকান্তরিতা মায়ের স্থান নেওয়া ঘরের বড়মেয়েটির যেভাবে চলা দরকার। কর্ত্রীর অধিকারে সে অতিথিদের সামনে দেখা দিত ব্লাউজ পরে, অফিসারদের ডাকত তাদের পদবি ধরে, মান্যুস্যার সঙ্গে ব্যবহার করত যেন সে তার মেয়ে, কথা কইত শিক্ষয়িত্রীর সুরে। নিজেকে সে বলত আইবুড়ি বৃদ্ধা— অর্থাৎ একেবারে নিশ্চিত ছিল যে তার বিয়ে হবে শিগগিরই।

যে কোনো আলোচনা, এমনকি আবহাওয়ার কথাটা নিয়েও সে নির্ঘাত তর্ক বাধিয়ে তুলত। কেমন যেন একটা জেদ ছিল তার; সবারই কথা শুনেই চেপে ধরবে, ফাঁক বার করবে, খুঁত দেখাবে। তার সঙ্গে কিছু একটা বিষয় বলতে শুরু করেছেন হয়তো, ভারিয়া কিন্তু স্থিরদৃষ্টিতে আপনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে বসবে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, পেত্রভ, দুদিন আগে আপনি একেবারেই উল্টোকথা বলছিলেন!' নয়তো উপহাসের হাসি হেসে জানাবে, 'তবে, লক্ষ করেছি, গোয়েন্দা পুলিশের নীতি প্রচার শুরু করেছেন আপনি। জয় হোক আপনার।'

আপনি যদি একটা কথার প্যাঁচ মারেন বা টিপ্পনী কাটেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তার গলা শোনা যাবে, 'বড় পুরনো!' কিংবা 'বড় মামুলি!' আর অফিসার কেউ রসিকতা করলে সে মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে বলবে, 'ফ্ ফ্ ফৌজি রসিকতা!' এবং তার এই ফ্ ফ্-ফ্-টা এমন জমকালো শোনাত যে টেবিলের তলা থেকে মুশকা নির্ঘাত জবাব দিত, 'গরর-গোঁ-গোঁ!'

চায়ের সময় এখন তর্কটা শুরু হয়েছিল স্কুলের পরীক্ষা নিয়ে নিকিতিনের বক্তব্য উপলক্ষ করে।

ভারিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মাপ করবেন সের্গেই ভাসিলিচ, আপনি বললেন, ছাত্ররা পেরে ওঠে না। কিন্তু দোষ কার, যদি জিগ্যেস করি? যেমন ধরুন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের আপনি রচনা লিখতে দিলেন 'মনস্তাত্ত্বিক পুশকিন'। প্রথমত, এমন কঠিন বিষয় দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, পুশকিনে আবার মনস্তত্ত্ব

কিসের? যদি বলতেন শ্চেদ্রিন, কি দস্তয়েভস্কি— সেটা অন্য কথা। কিন্তু পুশকিন হলেন শুধু একজন বড় কবি, তার বেশি কিছু নয়।'

'শ্চেদ্রিন শ্চেদ্রিন, পুশকিন পুশকিন', মুখ ব্যাজার করে বলল নিকিতিন।

'আমি জানি, আপনাদের স্কুলে আপনারা শ্চেদ্রিনকে মানতে চান না। তবে সেটা অন্য কথা। কিন্তু বলুন তো, পুশকিন আবার মনস্তাত্ত্বিক কোথায়?'

'নয়, বলছেন কী? বেশ আপনাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি।'

অনেগিন এবং বরিস গদুনভ থেকে কয়েকটা অংশ নিকিতিন আবৃত্তি করে শোনাল।

'এর মধ্যে মনস্তত্ত্ব তো কিছুই দেখলাম না', দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভারিয়া।

'মনস্তাত্ত্বিক বলি তাকে যে মানুষের মনের ভেতরকার আঁকুপাঁকুটা এঁকে দেখায়। আর এ তো নেহাত কিছু সুন্দর কাব্য, তার বেশি কিছু নয়।'

নিকিতিন বলল, 'বুঝতে পারছি, কী ধরনের মনস্তত্ত্ব আপনি চাইছেন। আপনি চান, একটা ভোঁতা করাতে কেউ আমার আঙুল কাটতে থাকুক আর গলা ফাটিয়ে আমি চেঁচাই— সেই হবে আপনার মনস্তত্ত্ব।'

'খুবই মামুলি খোঁচা! আপনি কিন্তু প্রমাণ করেননি কেন পুশকিন মনস্তাত্ত্বিক।'

নেহাত গতানুগতিক, সংকীর্ণ বা তদনুরূপ কোনোকিছুর প্রতিবাদ করতে হলে নিকিতিন সাধারণত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, দুই হাতে মাথা ধরে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। এবারেও সে তাই করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে মাথায় হাত দিয়ে টেবিলটার চারপাশ ঘুরে একটু কুঁথিয়ে দূরে গিয়ে বসল।

তার সাহায্যে এগিয়ে এল অফিসাররা। স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি ভারিয়াকে বোঝাতে লাগল যে পুশকিন সত্যিই মনস্তাত্ত্বিক, এবং প্রমাণ হিসেবে যে দুটি কবিতা দাখিল করল তার লেখক লের্মোন্তভ। লেফটন্যান্ট গের্নেৎ বলল, পুশকিন যদি মনস্তাত্ত্বিক না হতেন তাহলে মস্কোয় কখনোই তাঁর স্মৃতিমূর্তি স্থাপিত হত না।

'এটা একেবারে পেজোমি!' টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে শোনা গেল, 'আমি লাটসায়েবকে ঠিক এই কথাই বলে দিয়েছি, এটা হুজুর, পেজোমি!'

'তর্ক আমার থাক! যথেষ্ট হয়েছে!' চেঁচিয়ে বলল নিকিতিন আর ধমকে উঠল সোমকে, 'এ্যাহ্! ভাগ বলছি হতভাগা কুকুর!'

সোম তার হাঁটুর উপর মাথা আর থাবা তুলে বসেছিল।

'গররর... গোঁ-গোঁ...' শোনা গেল টেবিলের তলা থেকে।

'মানুন তাহলে আপনার ভুল!' বলে উঠল ভারিয়া, 'কবুল করুন!'

কিন্তু মহিলা অতিথিরা এসে যাওয়ায় তর্কটা আপনাআপনিই থেমে গেল। সবাই গেল হলঘরের দিকে। ভারিয়া বসল রয়্যাল পিয়ানোর সামনে, নাচের বাজনা বাজাতে লাগল। প্রথমে হল ওয়ালজ নাচ, তারপর পোলকা, তারপর

কাড্রিলের সঙ্গে Grand-rond— স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি এটি চালাল গোটা ঘর জুড়ে, তারপর ফের ওয়ালজ।

নাচের সময় বুড়োরা হলঘরটায় গিয়ে বসল, ধূমপান করতে করতে চেয়ে দেখছিল জোয়ানদের দিকে। এদের মধ্যে ছিলেন নগর ক্রেডিট সোসাইটি ডিরেক্টর শেবালদিন, সাহিত্য ও নাট্যকলা প্রীতির জন্য তিনি খ্যাত, স্থানীয় 'সংগীত নাট্যচক্রের' সূত্রপাত করেন তিনি, নাট্যানুষ্ঠানে নিজেও অংশ নিতেন, কিন্তু কেন জানি, অভিনয় করতেন কেবল কোনো হাস্যকর চাপরাশির ভূমিকায়, নয়তো সুর করে আবৃত্তি করতেন 'পাতকিনী'। শহরের সবাই তাঁকে বলত 'মমি', কেননা লোকটি যেমন লম্বা, তেমনি রোগা, দড়িপাকানো চেহারা, মুখখানায় সর্বদাই একটা জমকালো ভাব, চোখ দুখানা নেভা নেভা আর নিশ্চল। মঞ্চানুষ্ঠান তিনি এতই অকপটে ভালোবাসতেন যে নিজের দাড়িগোঁপও তিনি কামিয়ে ফেলেন, এবং তাতে তাঁকে আরো বেশি করেই 'মমি'র মতো দেখাত।

Grand-rond-এর পর উনি খানিকটা যেন অনিশ্চিতভাবে সসঙ্কোচে নিকিতিনের কাছে এসে একটু কেশে বললেন :

'চায়ের পর তর্কটায় হাজির থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। একই মতের লোক আমরা, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুবই কৃতার্থ হব। লেসিঙের 'গাম্বুর্গ নাট্যকলা' পড়েছেন আপনি?'

'আজ্ঞে না, পড়িনি।'

শেবালদিন ভয়ানক অবাক হয়ে এমনভাবে হাত নাড়লেন যেন তাঁর আঙুলে ছ্যাঁকা লেগেছে। তারপর কিছুই না বলে নিকিতিনকে ফেলে চলে গেলেন। শেবালদিনের মূর্তিটা, তাঁর প্রশ্ন এবং বিস্ময় সবই নিকিতিনের কাছে ভারি হাস্যকর ঠেকেছিল বটে, তাহলেও মনে হল :

'সত্যিই সঙ্কোচের কথা! আমি সাহিত্যের মাস্টার অথচ এখনো পর্যন্ত লেসিঙ পড়িনি। পড়ে ফেলতে হবে।'

রাতের খাওয়ার আগে তরুণবৃদ্ধ সবাই টেবিলে বসল 'ভাগ্যচক্র' খেলতে। দুই প্যাকেট তাস নেওয়া হল : এক প্যাকেট সবাইকে সমান করে বেঁটে দেওয়া হল, দ্বিতীয় প্যাকেটটি উপুড় করে রাখা হল টেবিলে।

'এ তাস কার হাতে?' বুড়ো শেলেস্তভ উপুড়-করা প্যাকেটের উপর থেকে একটা তাস টেনে নিয়ে সসমারোহে ঘোষণা করলেন, 'তার ভাগ্য এক্ষুনি খোকাখুকুদের ঘরে গিয়ে আয়াকে চুমু খেতে হবে।'

আয়াকে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন শেবালদিন। সবাই তাঁকে ঘিরে ভিড় করে নিয়ে গেল খোকাখুকুদের ঘরে, সহাস্যে করতালি দিয়ে তাঁকে চুমু খাওয়ানো হল। লেগে গেল চেঁচামেচি।

'আরে অমন আবেগভরে নয় হে!' হাসির চোটে চোখে জল এনে চেঁচালেন শেলেস্তভ, 'অত প্রেমাবেগে নয়।'

নিকিতিনের ভাগ্যে পড়ল সকলের স্বীকারোক্তি আদায় করা। ঘরের মাঝখানে চেয়ারে বসল সে। একটা শাল দিয়ে তার মাথা ঢাকা হল। সর্বাগ্রে তার কাছে পাপ স্বীকারে এল ভারিয়া।

অন্ধকারে তার কঠোর মুখভঙ্গিটা আঁচ করে নিকিতিন শুরু করল, 'জানি আপনার পাপ। বলুন তো দেবী, কোন্ অধিকারে আপনি রোজ ঘুরে বেড়ান পলিয়ানস্কির সঙ্গে? অহো, ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখি, খামোকা সে কি, খামোকা সে কি?'

'বড্ড ভোঁতা রসিকতা', বলে চলে গেল ভারিয়া।

তারপর শালের ঢাকনির নিচে জ্বলজ্বল করে উঠল বড় বড় স্থির দুই চোখ, অন্ধকারে ফুটে উঠল একটা কোমল মুখরেখা, নাকে এসে লাগল একটা ভারি প্রিয়, বহুপরিচিত ঘ্রাণ, যাতে মান্যুস্যার ঘরখানির কথা মনে পড়ে গেল নিকিতিনের।

'মারিয়া গদফ্রে', নিজের কণ্ঠস্বরই তার কাছে অচেনা লাগল, এত নরম নিচু সে গলা, 'কী আপনার পাপ?'

মান্যুস্যা চোখ মটকে জিভ দেখাল, তারপর হো হো করে হেসে পালাল। আর মিনিটখানেক পরেই সে হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাঁকল :

'খেতে চলুন! খেতে চলুন! খেতে চলুন!'

সবাই ছুটল খাবার ঘরে।

খাওয়ার পর ভারিয়া ফের তর্ক বাধাল এবং এবার বাপের সঙ্গে। পলিয়ানস্কি খাচ্ছিল ভারিক্কি চালে; হালকা লাল মদে চুমুক দিতে দিতে নিকিতিনকে গল্প বলছিল কীভাবে একবার শীতে, লড়াইয়ের সময়, সারারাত সে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে দাঁড়িয়েছিল এক জলায়; শত্রুরা ছিল অদূরেই, তাই কথা বলা বন্ধ, ধূমপান নিষেধ, রাতটাও ঠাণ্ডা, অন্ধকার, হাড়কাঁপানো বাতাস বইছিল।

গল্প শুনতে শুনতেই নিকিতিন আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল মান্যুস্যার দিকে। মান্যুস্যা কিন্তু তার দিকে চেয়েছিল স্থির অপলক দৃষ্টিতে, যেন কী একটা ভাবছে, আচ্ছন্ন হয়ে আছে... নিকিতিনের এটা ভালোও লাগল, কষ্টও হল। ভাবল, 'আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন? ঠিক শোভন নয়। লোকের চোখে পড়তে পারে। সত্যিই কী কচি মেয়েটা, কী সরল!'

রাত বারোটায় অতিথিরা বিদায় নিতে লাগল। নিকিতিন যখন ফটক পেরিয়েছে তখন দোতলায় সশব্দে জানালা খুলে গেল, দেখা গেল মান্যুস্যার মুখ।

'সের্গেই ভাসিলিচ!' ডাকল সে।

'কী হুকুম?'

'বলছিলাম কী ...' মান্যুস্যার বলার ধরন দেখে বোঝা গেল সে ভেবে নিচ্ছে কী বলবে, 'বলছিলাম কী, পলিয়ানস্কি কথা দিয়েছে দিনকয়েকের মধ্যেই সে তার ক্যামেরা নিয়ে এসে সকলের ফটো তুলবে। আসবেন কিন্তু।'

'বেশ।'

মান্যুস্যার মুখ সরে গেল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে কে যেন ঝঙ্কার দিল পিয়ানোয়।

'ঘর!' রাস্তা পার হতে হতে নিকিতিন ভাবল, 'হায় ঘর, যেখানে কূজন করে শুধু মিশরি পায়রা, কূজন করে কেননা অন্যভাবে আনন্দ প্রকাশ করার পথ নেই তাদের!''

কিন্তু আনন্দ কেবল শেলেস্তভদের ঘরেই নয়। শ-দুয়েক পা যেতে-না-যেতেই শোনা গেল আরেকটা বাড়ি থেকে পিয়ানোর আওয়াজ। আরো খানিকটা এগুতেই দেখা গেল ফটকের সামনে বালালাইকা বাজাচ্ছে একজন লোক। পার্কে রুশি গানের একটা ঝঙ্কার উঠল অর্কেস্ট্রায় ...

নিকিতিন থাকত শেলেস্তভদের বাড়ি থেকে আধ ভার্স্ট দূরে, আট কামরার এক ফ্ল্যাটে, বছরে তিনশ রুবলে এটি সে ভাড়া নিয়েছিল তার সহকর্মী, ভূগোল ও ইতিহাসের শিক্ষক ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচের সঙ্গে একত্রে। ইপ্পলিত ইপ্পিলিতিচ লোকটি এখনো বুড়ো হননি, মর্চেরঙা কোঁকড়ানো দাড়ি, একটু চোয়াড়ে ধরনের মুখ, মিস্ত্রিদের মতো, বুদ্ধিজীবীসুলভ নয়, কিন্তু ভালোমানুষ; নিকিতিন যখন ঘরে ফিরল তখন তিনি নিজের চেয়ারে বসে ছাত্রদের মানচিত্র সংশোধন করছেন। তাঁর ধারণায় ভূগোলের সবচেয়ে দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ম্যাপ আঁকা, আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে কালপঞ্জি। রাতের পর রাত বসে বসে তিনি ছাত্রছাত্রীদের ম্যাপ সংশোধন করতেন নয়তো কালপঞ্জির তালিকা বানাতেন।

কাছে এসে নিকিতিন বলল, 'কী অপূর্ব দিন আজ, আর আপনি কিনা ঘরে বসে? পারেন কী করে? অবাক মানছি।'

ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ আলাপী লোক নন। হয় তিনি চুপ করে থাকেন, নয়তো এমন বিষয়ে কথা বলেন যেটা সকলের কাছেই বহুদিন থেকে জানা। এখন তাঁর জবাবটা হল এই রকম :

'তা বটে, চমৎকার আবহাওয়া! মে মাস, আর কিছুদিন বাদেই খাঁটি গ্রীষ্ম। গ্রীষ্ম, সে তো আর শীতকালের মতো নয়। শীতকালে চুল্লি না জ্বালিয়ে উপায় নেই, আর গ্রীষ্মে বিনা চুল্লিতেই বেশ গরম। গ্রীষ্মকালে রাতে জানালা খুলে শোও না, দিব্যি গরম, আর শীতকালে দুই পাল্লার জানলা বন্ধ, তা-ও ঠাণ্ডা যায় না।'

টেবিলের কাছে এক মিনিটের বেশি বসে থাকতে পারল না নিকিতিন, একঘেয়ে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে বলল, 'শুভ রাত্রি! ভেবেছিলাম রোমান্টিক কিছু একটা শোনাব আপনাকে, নিজের ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু আপনি যে আবার

ভূগোলবিদ! প্রেমের কথা শুরু করলেই আপনি বলে বসবেন, "কালকা'র লড়াই হয়েছিল কোন্ সালে?" থাকুন আপনি আপনার লড়াই আর চুকচি অন্তরীপ নিয়ে।'

'সে কী, রাগ করলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মন খারাপ!'

এবং মান্যুস্যার কাছে নিজের মন মেলে ধরতে না পারায় আর এখন প্রেমের কথাটা শোনাবার মতো কাছে কেউ না থাকায় মন খারাপ করেই নিজের কাজের ঘরে গিয়ে সোফায় গা এলাল নিকিতিন। ঘরখানা অন্ধকার, চুপচাপ। শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে চেয়ে থেকে নিকিতিন কেন জানি ভাবতে লাগল, বছর দুই-তিন বাদে যে কোনো কারণেই হোক সে পিটার্সবুর্গ যাবে, মান্যুস্যা তাকে বিদায় দিতে আসবে স্টেশনে, কাঁদবে, পিটার্সবুর্গে লম্বা লম্বা চিঠি লিখবে সে, মিনতি করবে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। আর নিকিতিন তাকে লিখবে ... চিঠিটা সে শুরু করবে এইভাবে : আদরের ইঁদুরটি আমার ...

একেবারে ঠিক এই, 'আদরের ইঁদুরটি আমার,' আপন মনে কথাটা বলে হেসে উঠল সে।

শুয়ে থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল। মাথার তলে হাত গুঁজে সোফার পিঠের উপর বাঁ পাটা তুলে দিল। তাতে খানিকটা আরাম বোধ হল। ইতিমধ্যে বেশ ফরসা হয়ে উঠতে লাগল জানালাটা, আঙিনায় শোনা গেল নিদ্রাতুর মোরগের ডাক। নিকিতিন ভাবনাটা চালিয়ে গেল : কীভাবে সে পিটার্সবুর্গ থেকে ফিরবে, স্টেশনে মান্যুস্যা আসবে দেখা করতে, আনন্দে চিৎকার করে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে মান্যুস্যা; কিংবা আরো ভালো হবে, কিছু জানাবে না সে, চুপিচুপি হাজির হবে রাত্রে, রাঁধুনি দরজা খুলে দেবে, পা টিপে টিপে সে যাবে শোবার ঘরে, নিঃশব্দে পোশাক ছেড়ে— একেবারে বিছানায়! ধ্বক করে ঘুম ভেঙে যাবে মান্যুস্যার— আহ্ কী আনন্দ!

শূন্যটা সব স্বচ্ছ হয়ে উঠল। জানালা ঘর কিছুই আর নেই। যে বিয়ার কারখানাটার পাশ দিয়ে তারা আজ গিয়েছিল তারই দাওয়ায় বসে আছে মান্যুস্যা। কী যেন বলছে। তারপর নিকিতিনের বাহুলগ্না হয়ে সে গেল শহরতলীর পার্কটায়। সেখানে ওকগাছগুলো চোখে পড়ল নিকিতিনের, আর টুপির মতো সব কাকের বাসা। একটা বাসা দুলে উঠল, সেখান থেকে শেবালদিন মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, "লেসিঙ পড়েননি আপনি!"

সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল নিকিতিনের, চোখ মেলল সে। সোফার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ, ঘাড় ফিরিয়ে টাই আঁটছেন।

বললেন, 'উঠে পড়ুন, কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে। পোশাকআশাক পরেই ঘুমনো, বুঝেছেন, ঠিক নয়। এতে পোশাক নষ্ট হয়ে যায়। ঘুমনো উচিত বিছানা পেতে, পোশাক খুলে রেখে ...'

এবং বরাবরের মতোই দীর্ঘ একটানা সুরে তিনি তাই বলে যেতে লাগলেন যা সবাই চিরকালই জানে।

নিকিতিনের প্রথম পাঠটা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণিতে, রুশ ভাষা নিয়ে। ঠিক ন'টায় যখন সে ক্লাসে ঢুকল, তখন বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে বড় বড় করে দুটি অক্ষর লেখা : ম. শ.। সন্দেহ নেই অক্ষরদুটোর মানে মান্যুস্যা শেলেস্তভা।

"এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে বকাটেগুলো!" ভাবল নিকিতিন। "কোত্থেকে যে সব জানতে পারে?"

সাহিত্য নিয়ে দ্বিতীয় পাঠটা ছিল পঞ্চমশ্রেণিতে। এখানেও বোর্ডে লেখা ম. শ. এবং পড়া শেষ করে সে যখন ক্লাস থেকে ফিরছে তখন পেছন থেকে নিখুঁত থিয়েটারি ঢঙে চিৎকার উঠল :

'হুররে-রে-রে, শেলেস্তভা!'

পোশাক পরে ঘুমানোর ফলে মাথাটা কেমন ভার ভার। গা-ময় আলসেমি। পরীক্ষার আগে ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবার আশায় কিছুই করে না ছাত্ররা, আড়িমুড়ি ভাঙে, একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে দুষ্টুমি করে। নিকিতিনও আড়িমুড়ি ভাঙে, দুষ্টুমির দিকে নজর দেয় না, কারণে-অকারণে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে দেখা যায় রোদঢালা ঝকঝকে রাস্তা, ঘরবাড়িগুলোর উপর স্বচ্ছ নীল আকাশ, পাখি, আর দূরে বহু দূরে, সবুজ বাগান আর ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে অবাধ অসীম মাঠ, নীল হয়ে ওঠা তরুকুঞ্জ, ছুটন্ত ট্রেনের ধোঁয়া ....

সাদা উর্দি-পরা দুটি অফিসার অ্যাকেসিয়ার ছায়ায় হুইপ খেলতে খেলতে যাচ্ছে। গাড়ি চেপে সামনে দিয়ে গেল একদল ইহুদি, সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি। আয়া বেড়াচ্ছে ডিরেক্টরের নাতির সঙ্গে ... দুটো বেজাতে কুকুরের সঙ্গে কোথায় যেন ছুটে গেল সোম ... একটা মামুলি ধূসর গাউন আর লাল মোজা পরে চলেছে ভারিয়া, হাতে তার 'ইউরোপ বার্তা'। নিশ্চয় গিয়েছিল লাইব্রেরিতে ...

ওদিকে পড়ানোর কাজ শেষ হতে এখনো দেরি আছে ... আরো তিন ঘণ্টা! স্কুলের পরও ঘরে ফেরা নয়, শেলেস্তভদের বাড়িও নয়, যেতে হবে ভল্‌ফদের বাড়ি পড়াতে। ভল্‌ফ লোকটি ধনী ইহুদি, লুথারীয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, ছেলেমেয়েদের সে স্কুলে দেয়নি, স্কুলের মাস্টাররাই আসে তার কাছে, প্রতিটি পাঠের জন্যে সে দেয় পাঁচ রুবল করে ..

'কী একঘেয়ে! কী একঘেয়ে!"

বেলা তিনটেয় সে গেল ভল্‌ফদের বাড়ি, মনে হল যেন সেখানে কাটল এক পুরো যুগ। সেখান থেকে বেরুল পাঁচটায়। ওদিকে ঠিক সাতটার সময়েই ফের স্কুলে যাবার কথা, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট তৈরি করতে হবে।

বেশ রাত করে যখন সে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাত্রা করল শেলেস্তভদের বাড়ির দিকে, তখন বুক তার ঢিপঢিপ করছে, তপ্ত হয়ে উঠেছে মুখচোখ। হপ্তা কি

মাসখানেক আগে যতবারই সে তার মনের কথাটা খুলে বলবে ভেবেছে, প্রত্যেকবারই সে মনে মনে ভূমিকা উপসংহার সমেত পুরো একটা ভাষণ তৈরি করে রাখত, এখন কিন্তু তার তৈরি কথা একটিও নেই, সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে মাথায়; শুধু এইটুকু সে জানে, আজ নিশ্চয় কথাটা পাড়বে সে, আর অপেক্ষা করে থাকার উপায় নেই।

ভাবল, "বাগানে ডাকব ওকে, কিছুটা বেড়াব, তারপর বলব ..."

সামনের ঘরে জনপ্রাণী কেউ নেই। হলঘরে গেল সে, তারপর বৈঠকখানায় ... সেখানেও কেউ নেই। কানে আসছিল, উপরে দোতলায় কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে ভারিয়া, আর শিশুদের ঘরে ফরমাশ দিয়ে আনা দর্জি-মেয়ের কাঁচির শব্দ উঠছে।

বাড়িখানায় একটি ঘর ছিল যেটা তিনটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হত : ছোট ঘর, বারান্দা ঘর এবং অন্ধকূপ। সাবেক কালের এক মস্ত আলমারি ছিল সেখানে, তাতে থাকত ওষুধপত্তর, গুলিবারুদ এবং শিকারের সাজসরঞ্জাম। এই ঘর থেকেই দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি, তার উপর সর্বদাই ঘুমিয়ে থাকত নানা বেড়াল। দুটো দরজা ছিল, একটা শিশুঘরে আর একটা বৈঠকখানায়। উপরে যাবার জন্যে নিকিতিন ঘরটায় ঢুকতেই শিশুঘরের দুয়োর এমন দড়াম করে খুলল যে সিঁড়িটা আলমারিটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ছুটে ঢুকল মান্যুস্যা, গায়ে তার একটা কালো পোশাক, হাতে একটুকরো নীল ছিট; নিকিতিনকে লক্ষ না করেই সে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান ...' তাকে থামাল নিকিতিন, 'নমস্কার গদফ্রে .. একটা কথা ... '

হাঁপাতে লাগল নিকিতিন, ভেবে পেল না কী বলবে; একহাতে সে হাত ধরে রইল মান্যুস্যার, অন্যহাতে নীল ছিটটা। হয়তো-বা ভয়ে, হয়তো-বা বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল মান্যুস্যা।

পাছে-বা মান্যুস্যা পালিয়ে যায় এই ভয়ে বলে গেল নিকিতিন, 'একটা কথা... আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে ... তবে এখানে ঠিক বলা যায় না। আমি আর পারছি না, ক্ষমতা নেই ... বুঝতে পারছেন গদফ্রে... একেবারে পারছি না ....'

নীল ছিটটা মেঝেয় পড়ে গেল, মান্যুস্যার দ্বিতীয় হাতটাও ধরল নিকিতিন। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মান্যুস্যা, ঠোঁট কেঁপে উঠল, তারপর নিকিতিনের কাছ থেকে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল আলমারি আর দেয়ালের মাঝখানকার কোণটিতে।

'সত্যি বলছি ....' আস্তে করে বললে নিকিতিন, 'সত্যি বলছি মান্যুস্যা ...'

মান্যুস্যা তার মুখ তুলে ধরল, নিকিতিন চুমু খেল তার ঠোঁটে, চুম্বনটা প্রলম্বিত করার জন্যে দুই হাতের মধ্যে টেনে নিল তার গাল দুখানি। তারপর কেমন করে জানি, নিকিতিন নিজেও গিয়ে ঠেকল সেই দেয়াল-আলমারির কোণটিতে আর দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল মান্যুস্যা, মাথা গুঁজল তার থুতনিতে।

তারপর দুজনেই ছুটে গেল বাগানে।

শেলেস্তভদের বাগানটা বড়সড়, চার দেসিয়াতিন জমি। গোটাকুড়ি বুড়ো বুড়ো ম্যাপল আর লাইমগাছ, একটি ফার, বাকি সবই ফলের গাছ : চেরি, আপেল, নাশপাতি, বুনো কাঠবাদাম, একটি অলিভগাছ ... ফুলগাছও ছিল অনেক।

তরুবীথি ধরে ছুটল ওরা, হাসল, মাঝে মাঝে আচমকা এমন এক-একটা প্রশ্ন করল যার উত্তর দেবার দরকার ছিল না। আকাশে আধো চাঁদ, আর মাটিতে জোছনায় ম্লান আলোকিত অন্ধকার ঘাস-পাতার মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে নিঝুম টিউলিপ আর আইরিস ফুল, যেন মিনতি করছে তাদের কাছেও প্রেম নিবেদন হোক।

নিকিতিন আর মান্যুস্যা যখন ঘরে ফিরল, ততক্ষণে অফিসার আর তরুণী মহিলারা সবাই জুটেছে, মাজুর্কা নাচছে। সারা ঘরজুড়ে পলিয়ানস্কি ফের grand-gond পাক দিল, নাচের পর ফের সেই 'ভাগ্যচক্র' খেলা হল।

রাতের খাবার সময় অভ্যাগতরা যখন হলঘর ছেড়ে খাবার ঘরে গেল, তখন মান্যুস্যা নিকিতিনকে একা টেনে রেখে তার গায়ে গা ঘষে বলল :

'বাবাকে আর ভারিয়াকে তুমি নিজেই বলো। আমার লজ্জা করছে ...'

রাতের খাবার পর নিকিতিন বৃদ্ধকে কথাটা বলল। শোনার পর শেলেস্তভ খানিকটা ভেবে নিয়ে জানালেন :

'আমাকে আর আমার কন্যাকে আপনি এই যে সম্মানিত করলেন, তার জন্য ধন্যবাদ, তবে বন্ধুর মতো একটা কথা বলি। বাপ হিসেবে বলছি না, বলছি জেন্টলম্যানের কাছে জেন্টলম্যানের মতো। আচ্ছা বলুন তো, এত অল্পবয়সে বিয়ে করার এই শখটা আপনার কেন? অল্পবয়সে বিয়ে, সে করে চাষাভুষোরা, কিন্তু সে তো একটা পেজোমি, সবাই জানে। আর আপনি কেন বলুন তো? এত অল্প বয়সে বেড়ি পরে আপনার কোন্ রাজসুখ হবে?'

'বয়স আমার মোটেই অল্প নয়!' জবাব দিল নিকিতিন, '২৭ বছর।'

'ঘোড়ার বদ্যি এসেছে বাবা!' অন্য ঘর থেকে চেঁচাল ভারিয়া।

তাই আলাপটা থেমে গেল। ভারিয়া, মান্যুস্যা আর পলিয়ানস্কি নিকিতিনকে এগিয়ে দিল বাড়ি পর্যন্ত। গেটের কাছে ভারিয়া বলল :

'আপনার এই রহস্যময় মেত্রোপলিত মেত্রোপলিতিচ ব্যক্তিটি কোথাও দেখা দেন না কেন বলুন তো। আমাদের বাড়িতে আসলেও তো পারেন।'

নিকিতিন যখন পৌঁছল তখন রহস্যজনক ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ বিছানায় বসে প্যান্টুলুন ছাড়ছেন।

দম নিয়ে নিকিতিন বলল, 'শোবেন না ভায়া, শোবেন না, একটু দাঁড়ান ...'

ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ চটপট প্যান্টুলুন পরে শঙ্কিত স্বরে জিগ্যেস করলেন :

'কী হল?'

'বিয়ে করছি।'

পাশে বসে ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নিকিতিন একেবারে নিজের কাছেই নিজে অবাক হয়ে বলল :

'কল্পনা করুন, বিয়ে করছি! মারিয়া শেলেস্তভাকে! আজ প্রস্তাব দিয়েছি।'

'তা মন্দ কী! মেয়েটি তো মনে হয় ভালোই। তবে ভারি কচি।'

'তা বটে, কচি,' নিশ্বাস ফেলল নিকিতিন, উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়াল, 'ভারি, ভারি কচি!'

'স্কুলে আমার কাছে মেয়েটি পড়েছিল। আমি চিনি। ভূগোলটা মন্দ শেখেনি, কিন্তু ইতিহাসে কাঁচা। মন দিয়ে পড়া শুনত না।'

কেন জানি ভদ্রলোকের জন্যে হঠাৎ কেমন কষ্ট হল নিকিতিনের, ইচ্ছে হল ভালো কিছু, দরদী কিছু কথা বলে।

জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা আপনি বিয়ে করছেন না কেন ভায়া? যেমন ধরুন ভারিয়ার সঙ্গে বিয়ে, না হবার কী আছে ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ? চমৎকার, অপরূপ মেয়ে! অবিশ্যি খুব তর্ক করতে ভালোবাসে সত্যি, তবে মনটা ভালো ... কী অন্তঃকরণ! কিছু আগেই আপনার কথা জিগ্যেস করছিল। বিয়ে করে ফেলুন ওকে, কী বলেন?'

নিকিতিন ভালোই জানত এই একঘেয়ে বোঁচা-নাক লোকটিকে ভারিয়া কখনো বিয়ে করবে না, তাহলেও তাকেই বিয়ে করার জন্য সে ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচকে ভজাতে লাগল। কিন্তু কেন?

ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ একটু ভেবে বললেন, 'বিবাহ— এটি গুরুতর ব্যাপার। সব ভেবে দেখা দরকার, খতিয়ে দেখা দরকার, করে বসলেই হয় না। বিচার-বিবেচনায় ক্ষতি তো নেই, বিশেষ করে বিবাহের ব্যাপারে, লোকে যখন আর একলা থাকছে না, নতুন জীবন শুরু হচ্ছে।'

এবং ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ সেইসব কথাই বলে চললেন যা সকলেই বহুদিন থেকেই জানে। নিকিতিন শুনল না, বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। চটপট পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি করে তার সুখের কথা, মান্যুস্যা আর ভবিষ্যতের কথা ভাববে বলে, হাসল, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল লেসিঙ সে এখনো পড়েনি।

ভাবল, "পড়া দরকার ... কিন্তু কী দরকার পড়ে? ধুত্তোরি যত সব!"

সুখের পরিতৃপ্তিতে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সে, মুখের হাসিটি লেগে রইল সকাল পর্যন্ত।

স্বপ্ন দেখল : কাঠের মেঝের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে; স্বপ্ন দেখল প্রথমে আস্তাবল থেকে বার করে আনা হল কালো কুচকুচে কাউন্ট নুলিন, তারপর সাদা ভেলিকান, তারপর তার বোন মাইকাকে ...

২

'গির্জায় ভয়ানক ঠেসাঠেসি, গোলমাল, কে যেন একবার চেঁচিয়েও উঠল। আমার সঙ্গে মান্যুস্যার বিয়ে দিচ্ছিল যে পাদরি সে চশমার ভেতর দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললে :

"অমন ঘোরাঘুরি করে বেড়াবেন না গির্জায়, গোলমাল করবেন না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর-ভয় থাকা দরকার।"

'বিয়ের মালা টোপর ধরে রাখার জন্যে আমার দিক থেকে ছিল আমার দুজন বন্ধু, আর মান্যুস্যার দিক থেকে স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি আর লেফট্‌ন্যান্ট গের্নেৎ। ঐকসংগীত দলের গানটা হল চমৎকার। মোমবাতির দপদপানি, ঝলক, সাজসজ্জা, অফিসাররা, হাসিখুশি অসংখ্য মুখ আর মান্যুস্যার মুখের ভাবে অদ্ভুত কী একটা স্বচ্ছ আভা, গোটা পরিস্থিতিটা, মন্ত্রের শব্দগুলো— সবকিছুই আমায় অভিভূত করে তুলল, চোখে জল এসে গেল, মন ভরে উঠল একটা বিজয়ানন্দে।

ভাবলাম, ইদানীং কীভাবেই-না কুসুমিত হয়ে উঠল, কী কাব্যসুষমায় রঙিন হয়ে উঠল আমার জীবন। দু বছর আগেও ছিলাম ছাত্র, থাকতাম নিগ্লিন্নির এক সস্তা মেসে, টাকা নেই, আত্মীয়স্বজন নেই এবং তখন মনে হয়েছিল ভবিষ্যৎও নেই। এখন আমি গুবের্নিয়ার অন্যতম সেরা এক শহরে স্কুলের মাস্টার। পয়সা আছে, ভালোবাসা পেয়েছি, লোকের প্রশ্রয়ে ধন্য। ভাবলাম, এই তো আমার জন্যেই এখন এই ভিড় জমেছে, আমার জন্যেই জ্বলে উঠছে এই ঝাড়লণ্ঠন, আমার জন্যেই আর্কিডিকনের মুখে মন্ত্রধ্বনি, সংগীতদলের আয়োজন, আর আমার জন্যেই এই কচি, এই তন্বী, এই পুলকিত তরুণ প্রাণীটি, কিছুক্ষণ পরে যাকে লোকে বলবে আমার বউ। মনে পড়ল আমাদের প্রথম দেখা, শহরের বাইরে বেড়াতে যাওয়া, প্রেম নিবেদন, আর দিনগুলো— ইচ্ছে করেই যেন সারা গ্রীষ্মের দিনগুলো হয়ে উঠেছিল অপরূপ। আর নিগ্লিন্নির মেসে আমার কাছে যা সম্ভব মনে হয়েছিল কেবল গল্প-উপন্যাসে, সে সুখ যে আমি আজ সত্যিই পেলাম, যেন হাত ধরাধরি করে চলেছি সেই সুখের সঙ্গে।

'বিয়ের পরই সকলে হুড়মুড় করে ঘিরে ধরল আমাদের দুজনকে, অকপটে আনন্দ করল, অভিনন্দন জানাল, সুখ কামনা করল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল— সত্তরের কাছাকাছি এক বৃদ্ধ অভিনন্দন জানাল কেবল মান্যুস্যাকে, স্খলিত কাঁপা কাঁপা গলায় তাকে যে কথাগুলো সে বলল সেটা সমস্ত গির্জায় শোনা গেল :

"আশা করি মা, বিয়ের পরেও তুমি এমনি রাঙা টুকটুকে হয়েই থাকবে।"

'অফিসার, ডিরেক্টর এবং সমস্ত মাস্টাররা ভদ্রতা করে হাসলেন, আমিও টের পেলাম, আমার মুখেও একটা কৃত্রিম অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। আর অতি ভালোমানুষ, ইতিহাস-ভূগোলের শিক্ষক, সর্বদাই সবার জানা কথার পুনরুক্তিকারী ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ সজোরে আমার করমর্দন করে আবেগভরে বললেন :

"এতদিন আপনি ছিলেন অবিবাহিত, একা একা থেকেছেন, এবার আপনি হলেন বিবাহিত, দুজনে মিলে থাকবেন।"

'গির্জা থেকে সবাই আমরা গেলাম দোতলা বাড়িটিতে, এখনো এতে পলেস্তারা পড়েনি, বাড়িটি আমি পাব যৌতুক হিসেবে। বাড়ি ছাড়াও মারিয়া পাবে হাজার কুড়ি টাকা, আর কোন্ এক মেলিতোনোভস্কি না কোথাকার পোড়ো জমি, কুঁড়েঘরও আছে একটা; বলে অনেক হাঁসমুরগি নাকি রয়েছে সেখানে, দেখাশোনার কেউ না থাকায় সব বুনো হয়ে উঠছে। গির্জা থেকে ফিরে আমি আমার নতুন খাসকামরায় তুর্কি সোফায় ধপ করে বসে পড়ে আড়িমুড়ি ভেঙে হাত-পা ছড়ালাম, ধূমপান করতে লাগলাম, ভারি নরম গুটিসুটি আর স্বচ্ছন্দ বোধ হল, জীবনে কখনো এত আরাম বোধ করিনি।

এই সময় নিমন্ত্রিতরা "হুররে" বলে চেঁচিয়ে উঠল, সামনের ঘরে বাজে একটা যন্ত্রসংগীতে খুব ফলাও করে ঝঙ্কার দেওয়া হল। মারিয়ার দিদি ভারিয়া হাতে সুরাপাত্র নিয়ে ছুটে এল ঘরে, কেমন একটা অদ্ভুত উত্তেজিত চেহারা, মনে হয় যেন মুখভরা জল; মনে হয় আরো দূরে কোথাও ছুটে যেতে চেয়েছিল সে, কিন্তু হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে ডুকরে কেঁদে উঠল, মেঝের উপর ঝনঝন করে আছড়ে পড়ল সুরাপাত্রটা। সবাই আমরা ওর হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলাম।

"কেউ বুঝতে পারবে না," সবচেয়ে দূরের ঘরখানায় ধাই-মার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বিড়বিড় করছিল। "কেউ না, কেউ না! মাগো! কেউ বোঝে না!"

'সবাই অবশ্যি পরিষ্কারই বুঝেছিল যে মান্যুস্যার চেয়ে চার বছরের বড়দিদি সে, এখনো বিয়ে হয়নি, কাঁদছে সে ঈর্ষায় নয়, এই দুঃখে যে তার সময় বয়ে যাচ্ছে, হয়তো-বা গেছে। যখন সবাই কাড্রিল নাচছে, তখন সে ফের এল হলঘরে, মুখখানা কান্নাভরা, খুব করে পাউডার লাগিয়েছে; দেখলাম স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি তার সামনে আইসক্রিমের পাত্র ধরেছে, চামচে দিয়ে খাচ্ছে ভারিয়া ...

'ইতিমধ্যেই ভোর ছ'টা। নিজের পরিপূর্ণ বহু-বিচিত্র সুখের কথাটা লিখব বলে ডায়েরি টেনে নিলাম, ভাবলাম পাতা ছয়েক লিখে কাল মান্যুস্যাকে পড়ে শোনাব, কিন্তু আশ্চর্য, মাথার ভেতর সবকিছু যেন গুলিয়ে গেছে, আবছা হয়ে আছে স্বপ্নের মতো, তীব্রভাবে মনে পড়তে লাগল শুধু ভারিয়ার এই ঘটনাটা, ইচ্ছে হল লিখি : বেচারি ভারিয়া! বসে বসে শুধুই কেবল লিখি : বেচারি ভারিয়া! ইতিমধ্যে শনশন করতে লেগেছে গাছপালা, বৃষ্টি হবে; কাক ডাকছে আর আমার মান্যুস্যার মুখে, এইমাত্র ঘুমিয়েছে সে, কেন জানি একটা বিষাদের ছাপ।'

এরপর নিকিতিন অনেকদিন তার ডায়েরি ছোঁয়নি। আগস্টের প্রথম দিকটায় পরীক্ষার খাতাপত্র দেখা, নতুন ভর্তির কাজকম্ম ছিল; তারপর এসামপশন পরবের পর শুরু হল ক্লাসের পড়া। বরাবরের মতোই সে সকাল আটটার পরে যেত কাজে আর ন'টার পর থেকেই তার মন কেমন করত মারিয়ার জন্যে, নিজের

নতুন ঘরখানার জন্যে, ঘন ঘন ঘড়ি দেখত সে। নিচের ক্লাসগুলোতে সে ছেলেদের কাউকে শ্রুতিলিখনের ভার দিত, ছাত্ররা লিখে যেত আর সে জানালার বাজুতে বসে চোখ বুজে ভাবত; ভাবনাটা ভবিষ্যৎ নিয়েই হোক কি অতীতস্মৃতি নিয়েই হোক, সবই ছিল তার কাছে সমান মধুর, ঠিক রূপকথার মতো। উঁচু ক্লাসে সে পড়ে শোনাত গোগলের লেখা বা পুশকিনের গদ্য রচনা, তাতে ঘুম এসে যেত তার, কল্পনায় বড় হয়ে উঠত মানুষজন, গাছপালা, মাঠ, সওয়ারি ঘোড়া, আর মনে হত যেন-বা রচনাতেই মুগ্ধ হয়ে নিশ্বাস ফেলছে সে।

'কী চমৎকার!'

দুপুরের টিফিনের সময় তুষারের মতো ধবধবে সাদা তোয়ালে করে খাবার পাঠাত মান্যুস্যা, আর সে খেত ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, পরিতৃপ্তিটাকে প্রলম্বিত করে তুলত আর ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ বরাবরের মতো কেবল একটা বনরুটি দিয়েই লাঞ্চ সারতে সারতে তার দিকে তাকাত সসম্ভ্রমে, ঈর্ষায়, এবং কোনো একটা জানান্-কথাই মন্তব্য করে জানাত, যেমন :

'খাদ্য ছাড়া মশাই মানুষ বাঁচে না।'

স্কুলের পর নিকিতিন যেত টিউশনিতে, তারপর শেষপর্যন্ত পাঁচটার পর যখন ঘরে ফিরত, তখন যেমন আনন্দ হত তেমনি উদ্বেগ, যেন পুরো এক বছর সে বাড়ি আসেনি। ছুটে উঠত সে সিঁড়ি বেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে হাজির হত মান্যুস্যার কাছে, জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত আর শপথ করত তাকে সে ভালোবাসে, তাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না, বলত সাঙ্ঘাতিক মন কেমন করেছে তার, সভয়ে জিগ্যেস করত শরীর ভালো আছে তো, মুখটা তার বিষণ্ন কেন। তারপর খেতে বসত দুজনে মিলে। খাওয়ার পর সে তার কাজের ঘরে সোফায় গা এলিয়ে ধূমপান করত আর মান্যুস্যা তার কাছটিতে বসে মৃদুস্বরে কূজন করে যেত।

আজকাল তার সবচেয়ে সুখের দিন হল রবিবার আর ছুটির দিন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে তখন ঘরেই থাকে। একটা সরল-বাতুল কিন্তু অসাধারণ মধুর একটা জীবনে সে তখন ভূমিকা নিত, মনে হত সবই যেন কোনো এক রাখালিয়া কাব্য। তার বুদ্ধিমতী করিতকর্মা মারিয়া কীভাবে তাদের বাসাটি গড়ে তুলছে এটা সে লক্ষ করে যেত ক্রমাগত, আর বাড়িতে সে-ও নেহাত ফালতু কিছু নয় এইটে দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে সে নিষ্প্রয়োজন কিছু-একটা করে বসত, যেমন হয়তো চালা থেকে গাড়িটা ঠেলে বার করে খুঁটিয়ে দেখত তার চারিদিকটা। তিনটে গরু পুষত মান্যুস্যা, তা থেকে রীতিমতো এক ডেয়ারি ফার্ম চালাত সে, তার ভাঁড়ারের তলকুঠরিতে থাকত দুধ ভরা নানা কলসি আর ভাঁড়ভর্তি টক ক্রিম— এ সবই সে জমিয়ে রাখত মাখন তোলার জন্যে। মাঝে মাঝে রগড় করে নিকিতিন তার কাছে একগ্লাস দুধ চাইত, এতে তার নিয়মের গোলমাল হয়ে যাবার কথা— মান্যুস্যা তাই ভয় পেয়ে যেত, নিকিতিন কিন্তু হেসে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বলত :

'হয়েছে, সোনা আমার হয়েছে! এ তো ঠাট্টা করছিলাম!'

মাঝে মাঝে তার খুঁতখুঁতানিতে উপহাসও করত নিকিতিন। যেমন একদিন আলমারিতে পাথরের মতো শক্ত একটুকরো সসেজ না পনির পড়ে থাকতে দেখে সে ভারিক্কি সুরে বলে :

'এটা চাকরবাকরের খাবার জিনিস।'

নিকিতিন বলে যে ওরকম একটা টুকরোর একমাত্র জায়গা ইঁদুরধরা কলে, কিন্তু মান্যুস্যা ভারি উত্তেজিত হয়ে প্রমাণ করে দেয় যে, পুরুষেরা সংসারের কিছুই বোঝে না, চাকরবাকরদের জন্যে তিন মণ খাবার পাঠালেও তাদের মন পাওয়া ভার আর নিকিতিন কথাটা মেনে নিয়ে পুলকিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে। তার কথায় যৌক্তিকতা যদি কিছু থাকত তো সেটা নিকিতিনের কাছে মনে হত অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য; আর যেটা তার দৃঢ়বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেত, সেটা নিকিতিনের কাছে লাগত ছেলেমানুষি, কেমন যেন মর্মস্পর্শী।

মাঝে মাঝে দার্শনিক মেজাজে পেয়ে বসত তাকে, বিমূর্ত কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে সে আলোচনা করে যেত আর কৌতূহলের চোখে মান্যুস্যা চেয়ে থাকত তার মুখের দিকে।

মারিয়ার আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করত সে, নয়তো তার বেণি খুলত আর বাঁধত আর বলে যেত, 'জানো, তোমায় পেয়ে আমার সুখের আর সীমা নেই। কিন্তু আমি মনে করি না, এ সুখটা আমার এমন কিছু নয়, যা হঠাৎ মিলে গেছে, আকাশ থেকে পড়েছে। এ সুখ খুবই স্বাভাবিক, সঙ্গত, যুক্তিসিদ্ধ একটা ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, মানুষ নিজে তার নিজ সুখের স্রষ্টা আর আমি এই যা পেয়েছি, এটা আমারই সৃষ্টি। হ্যাঁ, কোনোরকম ভণিতা না করেই বলব, এ সুখ গড়েছি আমি নিজে, স্বাধিকারেই সেটা আমার। আমার অতীত তো তুমি জানো। অনাথ ছেলে, দারিদ্র্য, দুঃখের শৈশব, বিরস তারুণ্য— এ সবই হল সংগ্রাম, এ সবই হল আমার সুখে পৌঁছবার পথ ....'

অক্টোবরে স্কুলের একটা গুরুতর ক্ষতি হল। ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচের মাথায় ইরিসিপ্লাস হয়ে মারা যান। মৃত্যুর দুইদিন আগে তিনি চৈতন্য হারান ও ভুল বকতে থাকেন, কিন্তু ভুল বকার মধ্যেও শুধু তাই বলেন যা সকলেরই জানা :

'ভলগা নদী ক্যাস্পিয়ন সাগরে পতিত হয় ... ঘোড়ায় খায় দানা আর ছানি ...'

যেদিন তাঁকে কবর দেওয়া হয় সেদিন স্কুলে পড়া বন্ধ ছিল। কফিন বয়ে নিয়ে যায় বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রেরা এবং স্কুলের ঐকতান গায়কেরা কবরখানা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা গান করে যায়— 'হে স্বর্গীয় প্রভু'। মিছিলে যোগ দেয় তিনজন পাদরি, দুজন ডিকন, ছেলেদের স্কুলের সমস্ত লোকেরা এবং সাজপোশাক পরা গির্জার গায়কদল। এমন ঘটা করে সৎকারের আয়োজন দেখে পথচারীরা ক্রুশ করে বলছিল :

'ভগবান করুন, সবাই যেন অমন করে মরতে পায়।'

কবরখানা থেকে ফিরে বিচলিত হৃদয়ে নিকিতিন ডায়েরিটা বার করে লেখে :

'ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ রিকিৎস্কিকে সমাধি দেওয়া হল।

'সাধাসিধে মানুষটি, শান্তি হোক তোমার! মারিয়া, ভারিয়া এবং যারা ছিল সমস্ত মেয়েই অকপটে কেঁদে ফেলে, হয়তো এই কারণে যে, কোনো একজন নারীও যে কখনো এই আকর্ষণহীন, হতভাগ্য মানুষটিকে ভালোবাসেনি, সেটা তারা জানত। সমাধিস্থলে বন্ধুর উদ্দেশে কয়েকটা দরদের কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সবাই হুঁশিয়ার করে দিল, ডিরেক্টরের সেটা হয়তো ভালো লাগবে না, মৃত ব্যক্তিটিকে তিনি পছন্দ করতেন না। বিয়ের পর মনে হয় আজ এই প্রথমদিন বুকটা আমার ভারাক্রান্ত লাগছে ....'

এরপর গোটা পাঠ্যবৎসরে বিশেষ ঘটনা আর কিছু ঘটেনি।

সেবার শীতকালটা হল কেমন ম্যাড়মেড়ে, কড়া ঠাণ্ডা পড়ল না, ভেজা ভেজা বরফ। যেমন, বড়দিনের সময় সারারাত বাতাস গোঙাল ঠিক হেমন্তের মতো, ছাত থেকে জল গড়িয়ে পড়ত, আর সকালে জলপুজোর সময় পুলিশ কাউকে নদীতে নামতে দিল না, লোকে বলল বরফ নাকি ফেঁপে উঠে কালো হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিচ্ছিরি আবহাওয়া সত্ত্বেও নিকিতিনের দিন কাটল ঠিক গ্রীষ্মকালের মতোই আনন্দে। বরং চিত্তবিনোদনের অতিরিক্ত একটা উপলক্ষও জুটল, 'ভিন্ত' খেলা শিখল সে। শুধু একটা জিনিস তাকে মাঝে মাঝে অস্থির ও ক্ষুব্ধ করে তুলত এবং মনে হল যেন পরিপূর্ণ সুখের পথে ওই একটিই বাধা। এটা হল ওই কুকুর আর বেড়ালগুলো, যা সে যৌতুক হিসেবে পেয়েছিল। ঘরগুলোতে সর্বদাই, বিশেষ করে সকালবেলাটায় গন্ধ ছাড়ত ঠিক চিড়িয়াখানার মতো এবং কিছুতেই সে গন্ধ দূর করা যেত না। বেড়ালগুলো প্রায়ই লড়াই লাগাত কুকুরের সঙ্গে। বদরাগী মুশকাকে খাওয়ানো হত দিনে দশবার করে, ঠিক আগের মতোই সে এখনো নিকিতিনকে সইতে পারত না, গরগরিয়ে উঠত :

'গ-র-র-র-ঙ্গো-ঙ্গো-ঙ্গো...'

তাস খেলত সে ক্লাবে, সেখান থেকে মাঝরাতে সে ফিরল কেমন যেন লেন্ট পরবের উপবাসী চেহারায়। বৃষ্টি হচ্ছিল, চারিদিক অন্ধকার, কাদা কাদা। কেমন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হচ্ছিল মনের মধ্যে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সেটা কীসের জন্যে : ক্লাবে তাসের বাজিতে বারো রুবল হেরেছে সেইজন্যে, নাকি হিসাব মেটাবার সময় একজন খেলুড়ে স্পষ্টতই তার যৌতুক নিয়ে খোঁটা দিয়ে যে মন্তব্যটা করেছিল— নিকিতিনের টাকায় ছাতা পড়ছে, সেইজন্যে? বারো রুবলের জন্যে তেমন মায়া নেই তার, আর খেলুড়ের কথাটার মধ্যেও অপমানকর কিছু ছিল না, তাহলেও খারাপ লাগছিল কেমন। ঘরে ফিরতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

'ইশ্, কী বিচ্ছিরি লাগছে!' লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে অস্ফুট উক্তি করল সে।

মনে হল, বারো রুবলের জন্যে তার যে মায়া নেই সেটা এইজন্যে যে টাকাটা সে পেয়েছে দান হিসেবে। খেটে রোজগার করতে হলে সে প্রতিটি কোপেকের দাম বুঝত, হারজিতের প্রশ্নে অমন নির্বিকার বোধ করত না। বলতে কী তার সমস্ত সুখটাই, ভাবল সে, পাওয়া গেছে দান হিসেবে, অকারণে, এবং সুস্থের পক্ষে ওষুধের মতোই এটা তার কাছে বাহুল্য মাত্র। অধিকাংশ লোকের মতো সে যদি একটুকরো রুটির ধান্ধায় হন্যে হত, বেঁচে থাকার জন্যে লড়ত, কাজের ভারে যদি তার বুকে-পিঠে টনটন করত; তাহলে রাতের অন্নটা, উষ্ণ আয়েশি ঘরখানা, পারিবারিক সুখ— এটা হত তার প্রয়োজন, তার পুরস্কার, তার জীবনের শোভা। এখন এসবের সমস্ত অর্থটাই যেন কেমন বিদঘুটে অনিশ্চিত।

'উহ্ কী বিচ্ছিরি', পুনরাবৃত্তি করল সে, মনে মনে বেশ বুঝল যে এই ধরনের ভাবনাটাই হল অশুভ লক্ষণ।

যখন ঘরে ফিরল, ততক্ষণে মারিয়া শুয়ে পড়েছে। সমান তালে নিশ্বাস পড়ছে তার, মুখে হাসি, বোঝা যায় খুব তৃপ্তি করে ঘুমুচ্ছে। তার কাছেই গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে সাদা বেড়ালটা, ঘড়ঘড় করছে। নিকিতিন আলো জ্বেলে ধূমপান করতেই মারিয়া জেগে উঠল, তেষ্টা মিটিয়ে একগ্লাস জল খেল।

'মার্মেলাড খেয়েছি কি না', বলে হাসল সে, তারপর একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'তুমি বুঝি আমাদের ওখানে গিয়েছিলে?'

'না, যাইনি।'

নিকিতিন জানত, ভারিয়া ইদানীং যার ওপর খুবই ভরসা করেছিল সেই স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কি পশ্চিমের একটি গুবের্নিয়ায় বদলি হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পরিচিতদের কাছে তার বিদায় জানাতে শুরু করেছে, সুতরাং তার শ্বশুরবাড়িটি এখন একটু নিরানন্দ।

মারিয়া বসল। বলল, 'সন্ধ্যায় ভারিয়া এসেছিল। কিছুই বলল না বটে, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যায় কী কষ্ট বেচারির। পলিয়ানস্কিকে এখন আর সইতে পারে না। ধুমসো, থলথলে, যখন হাঁটে কি নাচে, গালের মাংস দুলে দুলে ওঠে ... আমার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না। তাহলেও ভেবেছিলাম, ভদ্র লোক।'

'আমি এখনো তাকে ভদ্রই ভাবি।'

'কিন্তু ভারিয়ার সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করল কেন?'

'খারাপ কিসের?' জিগ্যেস করল নিকিতিন। পিঠ বেঁকিয়ে আড়িমুড়ি ভাঙছিল সাদা বেড়ালটা, তার বিরুদ্ধে বিরক্তবোধ করতে শুরু করল সে। 'আমি যতদূর জানি, সে প্রস্তাব উত্থাপন করেনি, কোনোরকম কথাও দেয়নি।'

'তবে আমাদের বাড়িতে অমন ঘন ঘন আসত কেন? বিয়ে করবে না বলে যদি ঠিকই করে থাকো, তবে এসো না।'

নিকিতিন বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমনো বা শুয়ে থাকা কোনোটাই তার পছন্দ হচ্ছিল না। মনে হল, মাথাটা যেন তার প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে একটা ফাঁপা গোলাঘরের মতো, আর দীর্ঘ ছায়ার মতো নতুন, জরুরি কী একটা ভাবনা যেন সেখানে সঞ্চরণ করে ফিরছে। ভাবল, শান্ত সাংসারিক মাধুর্য উদ্ভাসিত করে তোলা প্রদীপের আলোটা ছাড়াও, নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় যে জগৎটায় দিন কাটাচ্ছে সে আর এই বেড়ালটা— এই জগৎটা ছাড়াও যে আরো একটা জগৎ আছে... সহসা এই অপর জগৎটার জন্য উদগ্র, বিরহার্ত একটা কামনা বোধ করল সে, কোথাও একটা কলে কি কারখানায় নিজেই কাজ করতে চায় সে, বক্তৃতা দিতে চায় মঞ্চ থেকে, লিখতে চায়, ছাপাতে চায়, চিৎকার করতে চায়, চায় ক্লান্ত হতে, যন্ত্রণা পেতে। এমন একটা কিছু চাইল সে যাতে সে তন্ময় হয়ে ভুলে যাবে নিজেকে, উদাসীন হতে পারবে তার ব্যক্তিগত সুখের প্রশ্নে, যে সুখের স্বাদটা এত একঘেয়ে। কল্পনার মধ্যে হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিল শেবালদিন, দাড়িগোঁপ কামানো মুখে আঁতকে উঠে তিনি বললেন :

'লেসিঙ-ও পড়েননি দেখছি! কীরকম পিছিয়ে পড়া লোক আপনি? ঈশ্বর, কীরকম অধঃপতন হয়েছে আপনার।'

মারিয়া ফের জল খেতে লাগল। নিকিতিন তাকাল তার গ্রীবার দিকে, তার নিটোল ঘাড় আর বুকের দিকে, মনে পড়ল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গির্জায় একদিন যে কথাটা বলেছিল : টুকটুকে!

'টুকটুকে', অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল সে।

জবাবে খাটের তল থেকে গরগর করে উঠল নিদ্রাতুর মুশকা :

'গ-র-র-র-ঙ্গো-ঙ্গো-ঙ্গো...'

ঠাণ্ডা একটা হাতুড়ির মতো বুকের মধ্যে তার ঘা মারতে লাগল একটা তীব্র জ্বালা। ইচ্ছে হল মারিয়াকে রূঢ় কর্কশ কিছু একটা বলে, এমনকি ঝাঁপিয়ে পড়ে মারে তাকে। বুক ঢিপঢিপ করে উঠল তার।

নিজেকে সংযত করে সে জিগ্যেস করল, 'তার মানে বলতে চাও, আমি যখন তোমাদের বাড়িতে হাজিরা দিয়েছি তখন অবশ্যই তোমায় বিয়ে করতে বাধ্য?'

'নিশ্চয়! তুমি নিজেই সেটা খুব ভালোই বোঝো।'

'খাসা! সুন্দর!'

মিনিটখানেক পরে ফের সে পুনরাবৃত্তি করল :

'সুন্দর!'

বাড়তি কথা যাতে কিছু বলে না ফেলে, বুকটা যাতে একটু সুস্থির হয়, এই উদ্দেশ্যে নিকিতিন চলে গেল তার নিজের কাজের ঘরে, বিনা বালিশে শুয়ে পড়ল প্রথমে সোফায়, তারপর খানিকটা মেঝেয়, গালিচার উপর।

নিজেকে সে বুঝ দিল, "যতসব বাজে ভাবনা! তুই একটা শিক্ষক, একটা উদার বৃত্তি তোর ... অন্য আর কোন্ জগৎ তোর দরকার? কী পাগলামি!"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই সে নিশ্চিত করেই বুঝল যে সে শিক্ষক আদৌ নয়, মাত্র এক চাকুরে, গ্রিক ভাষার মাস্টার চেক লোকটির মতোই গুণহীন, বিশেষত্বহীন। শিক্ষকতার জন্য কোনো আগ্রহই তার কখনো ছিল না, কোনো জ্ঞান ছিল না অধ্যাপনার, এতে তার কোনো আকর্ষণই নেই, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিভাবে কথা কইতে হয় তাই সে জানে না। সে যেটুকু অধ্যাপনা করেছে তার মূল্য কী সে নিজেই জানে না, আর খুবই সম্ভব, সে হয়তো তাই পড়িয়েছে যার প্রয়োজন নেই। লোকান্তরিত ইপ্পলিত ইপ্পলিতিচ ছিলেন খোলাখুলিই একটি ভোঁতা লোক; বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, ছাত্র সবাই জানত মানুষটা কী, কী জিনিস আশা করা যায় তার কাছ থেকে; কিন্তু সে, নিকিতিন— ঠিক চেক লোকটার মতোই যে সে তার স্থূলতা রাখতে পারে ঢেকে, চমৎকার ঠকাতে পারে সবাইকে, ভাব দেখাতে পারে যেন তার সবকিছুই ভালোই চলছে। এই নতুন ভাবনাটায় ভয় পেয়ে গেল নিকিতিন, এটাকে সে অস্বীকার করতে চাইল, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বলে সে এটাকে অভিহিত করল, ভাবল এসব নেহাতই স্নায়ুর ব্যাপার, পরে এসব ভেবে তার নিজেরই হাসি পাবে।

এবং সত্যিই, সকালের দিকে সে নিজের স্নায়বিকতায় হাসল, নিজেকে সে বলল একেবারে মেয়েমানুষেরও অধম। কিন্তু মনে মনে এটা তার কাছে খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে তার শান্তি গেছে সম্ভবত চিরকালের জন্যই, এবং এখনো পলেস্তারা-না-পড়া এই দোতলা বাড়িখানায় তার সুখ আর সম্ভব নয়। সে বুঝল যে মোহটা কেটে গেছে, শুরু হয়ে গেছে একটা নতুন, স্নায়বিক, সচেতন জীবন, যার সঙ্গে শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের সামঞ্জস্য হবে না।

পরের দিন রবিবার, নিকিতিন গেল স্কুলের গির্জায়, দেখা হল ডিরেক্টর ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। মনে হল এদের সকলেরই যেন কেবল একটি চেষ্টা, কী করে নিজেদের অজ্ঞতা ও অসন্তোষ ঢেকে রাখবে; আর তার আপন অস্থিরতা যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে, তাই নিজেও সে অমায়িকভাবে হাসল, কথা কইল যত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। তারপর স্টেশনে গিয়ে সে দেখতে লাগল ডাক-ট্রেন এল, চলে গেল; এইটেতে সে তৃপ্তি পেল যে সে একা, কারো সঙ্গে কথা কইতে হচ্ছে না।

বাড়ি ফিরে দেখল শ্বশুর আর ভারিয়া এসেছে, দুপুরের খাওয়াটা তাদের আজ এখানেই খাওয়ার কথা। ভারিয়ার চোখে কান্না, বলল মাথাব্যথা করছে, শেলেস্তভ প্রচুর পরিমাণ খেলেন, আর গল্প করলেন : আজকালকার ছেলেমেয়েদের ওপর ভরসা করা যায় না, জেন্টলম্যানসুলভ গুণ তাদের কিছু নেই।

তিনি বলছিলেন, 'এটা একেবারে পেজোমি! আমি তাকে ঠিক এই কথাই বলে দেব, এটা মশায় পেজোমি!'

নিকিতিন অমায়িকভাবে হাসল, অতিথি আপ্যায়নে সাহায্য করল মারিয়াকে, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর নিজের কাজের ঘরে গিয়ে খিল তুলে দিল।

মার্চের সূর্য জ্বলজ্বল করছে, জানালার শার্শির মধ্যদিয়ে তপ্ত রোদ এসে পড়েছে টেবিলে। সবে ২০ তারিখ, কিন্তু শ্লেজ ছেড়ে ইতিমধ্যেই চাকার গাড়ির চলাচল শুরু হয়েছে, বাগানে কিচিরমিচির লাগিয়েছে স্টার্লিং। সময়টা ঠিক এমনি যে মনে হল এক্ষুনি যেন মারিয়া এসে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে : গাড়িবারান্দায় ঘোড়া কি গাড়ি তৈরি, কী পরবে মারিয়া, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে? ঠিক আগের বছরের মতোই অপরূপ হয়ে শুরু হয়েছে বসন্ত, ঠিক এইরকম আনন্দের প্রতিশ্রুতি তার ... কিন্তু নিকিতিন ভাবতে লাগল, কী ভালোই হয় যদি সে এখন ছুটি নিয়ে মস্কো যেতে পারে, ওঠে তার নিগ্লিন্নি রাস্তার পরিচিত মেসটায়। পাশের ঘরে কফি খাচ্ছে সবাই আর স্টাফ ক্যাপটেন পলিয়ানস্কিকে নিয়ে আলোচনা করছে, নিকিতিন সে আলোচনায় কান দিতে চাইল না, ডায়েরিতে সে লিখল :

'ঈশ্বর, এ আমি কোথায়? মামুলি, মামুলি সবকিছু। একঘেয়ে তুচ্ছ সব লোক, টকক্রিমের ভাঁড়, দুধের কলসি, আরশোলা, নির্বোধ নারী... একঘেয়ে মামুলিয়ানার চেয়ে ভয়ঙ্কর, অপমানকর আর কিছু নেই। পালাতে হবে এখান থেকে, আজই পালাতে হবে, নইলে যে পাগল হয়ে যাব!'

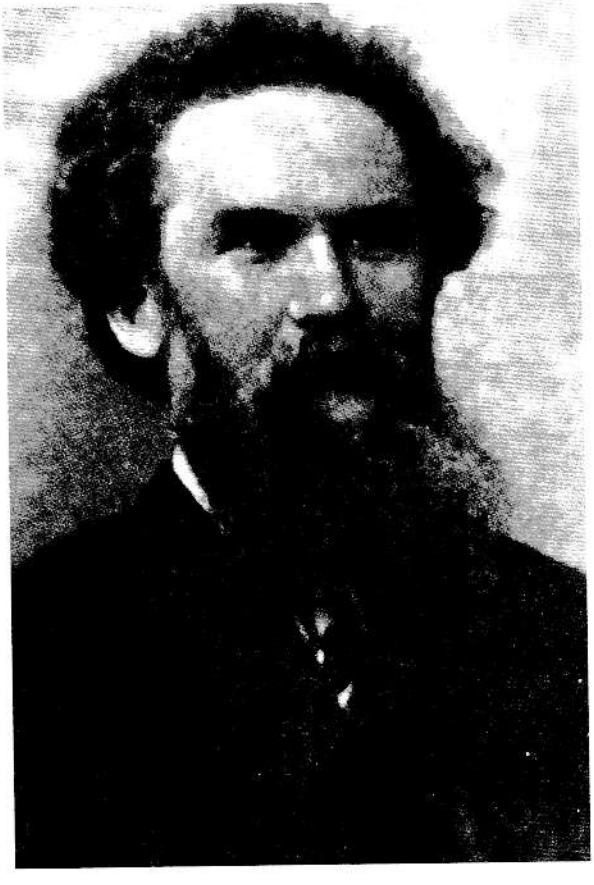

করলেঙ্কো ভ্লাদিমির গালাকতিওনভিচ (১৮৫৩-১৯২১)— বিখ্যাত সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী।

'বন-গর্জন' (১৮৮৬) গল্পটির মধ্যে উনিশ শতকের শেষ দিককার রুশ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য খুবই প্রকাশ পেয়েছে; রাশিয়ায় প্রাক-বিপ্লব যুগের মেজাজ ফুটে উঠেছে এতে।

ভ্লাদিমির করলেঙ্কো
বন-গর্জন

কত কালের কথা

১

মর্মর তুলল বন ...

এ বনে মর্মর বাজে চিরকাল— সমতালে, টেনে টেনে, দূরাগত কোনো ধ্বনির রেশের মতো, শান্ত অস্ফুট, বাক্যহীন কোনো মৃদু গানের মতো, অতীতের আবছা কী এক স্মৃতির মতো। চিরকাল মর্মর তোলে বন, কেননা বনটা প্রাচীন, নিঝুম, কাঠুরের কুড়ুল-করাত এখনো তাতে পড়েনি। উঁচু উঁচু পাইনগাছ, মহাকায় কাণ্ডগুলোয় লাল রঙ ধরেছে, দাঁড়িয়ে আছে থমথমে এক অক্ষৌহিণীর মতো, সবুজ শাখায় নিরেট করে তুলেছে উপরটায়। শান্ত বনতল, বাতাসে দারু-গন্ধ, পাইনের ঝরা পাতায় মাটি ঢাকা, তার আড়াল ফুঁড়ে মাথা তুলেছে উজ্জ্বল ফার্ন, সাড়ম্বরে এলিয়ে দিয়েছে তার অপরূপ ঝালর, দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে, পাতাটিও কাঁপে না। আর্দ্র কোনাকানাচে লম্বা লম্বা ডাঁটিতে খাড়া হয়ে উঠেছে সবুজ ঘাস; যেন এক শান্ত আলস্যে গুরুভার মাথা নুইয়ে দিয়েছে সাদা ক্লোভার ফুল। আর উপরে, অবিরাম, অনন্তকাল বয়ে চলেছে বনমর্মর, প্রাচীন অরণ্য যেন অস্ফুট নিশ্বাস ছাড়ছে।

এ নিশ্বাস কিন্তু এবার হয়ে উঠল গভীর, প্রবল। বনপথে যাচ্ছিলাম আমি, আকাশ চোখে দেখা না গেলেও বনের ভ্রুকুঞ্চনে বুঝলাম, তার উপর ঘনকৃষ্ণ মেঘ জমছে। পড়ন্ত বেলা। গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও সূর্যাস্তের বাঁকা রোদ এখনো এসে পড়ছে, কিন্তু গহিন অংশগুলোয় ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে আবছা অন্ধকার। সন্ধ্যার দিকে বাজ ডাকতে লাগল।

শিকারের ভাবনা আজ তুলে রাখতে হয়। ঝড়বৃষ্টির আগেই রাতের ডেরায় ফিরে যাওয়া ভালো। ঘোড়াটা খুর ঠুকতে লাগল উঁচু হয়ে ওঠা শিকড়ের উপর, ঘোঁৎঘোঁৎ করে কান খাড়া করে শুনল ফেটে-পড়া অরণ্য প্রতিধ্বনির গুরুগুরু। নিজেই ঘোড়াটা গতি বাড়াল পরিচিত বনকুটিরের দিকে।

কুকুর ডেকে উঠল। গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল মেটে দেয়ালের ঝলক। ধোঁয়ার একটা নীল স্রোত মাথা ঠুকছে সবুজ গাছপালার নিচে। হেলে পড়া একটা কুঁড়ে তার এলোমেলো চালাসমেত লালরঙা পাইনগুঁড়ির কোলে ঠাঁই নিয়েছে। ঠিক যেন মাটিতেই গজিয়েছে কুঁড়েটা, আর সুঠাম সটান পাইনগাছগুলো সগর্বে মাথা নাড়ছে তাকে দেখে। ফাঁকা মাঠটুকুর মাঝামাঝি একেবারে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে একগুচ্ছ নবীন ওকগাছ।

এইখানেই থাকে আমার শিকারযাত্রার সহচর— জাখার আর মাক্সিম। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে দুজনের কেউ বাড়ি নেই, কেননা প্রকাণ্ড শিকারি কুকুরের ডাক শুনেও কেউ বেরিয়ে এল না। শুধু বুড়ো দাদু দাওয়ায় বসে বসে লাপতি বুনছে। মাথাভরা তার টাক, পাকা মোচ প্রায় কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, দু-চোখের দৃষ্টি কেমন নিভন্ত, যেন কী একটা মনে করতে চাইছে, মনে পড়ছে না।

'নমস্কার দাদু! ঘরে আছে কেউ?'

মাথা নাড়ল বুড়ো, 'না গো, জাখারও নেই, মাক্সিমও নেই, আর মত্রিয়াও বনে গেল গরুর খোঁজে ... কোথায় পালিয়েছে গরুটা, ভালুক-টালুকেই খেল হয়তো ... এই হল ব্যাপার, কেউ নেই!'

'ঠিক আছে, নয় তোমার কাছেই একটু বসি, অপেক্ষা করি!'

'তা বসো কেন, বসো,' মাথা নাড়ল বুড়ো; ওকের ডালে ঘোড়াটা বাঁধছিলাম, বুড়ো তার ক্ষীণ ঘোলা ঘোলা চোখে চেয়ে দেখছিল আমাকে। হাল খারাপ বুড়োর; চোখে দেখে না, হাত কাঁপে।

'আর তুমি কে বটে বাছা?' দাওয়ায় এসে বসতে জিগ্যেস করল বুড়ো।

এ প্রশ্নটা আমায় প্রত্যেকবারই শুনতে হয়।

'ওহো, এবার চিনেছি, চিনেছি,' ফের লাপতি বোনা শুরু করে বুড়ো বলে, 'বলিস না আর বুড়ো মাথা, একেবারে চালুনের মতো, কিছুই মনে থাকে না। অথচ এই দ্যাখ যারা কতদিন মরে গেছে, তাদের মনে আছে ঠিক, হাঁ গো, দিব্যি মনে পড়ে! কিন্তু নতুন লোকজন, সব ভুলে যাই ... দুনিয়ায় কাটল তো কম নয়।'

'আচ্ছা দাদু, বনে তুমি আছ কতদিন, অনেকদিন?'

'হাঁ গো, ঢের দিন! ফরাসিরা সেই যে জারের রাজ্যে এসেছিল, সে-ও দেখেছি।'

'জীবনে তুমি তো অনেক দেখেছ দাদু, বলো না কিছু একটা শুনি।'

অবাক হয়ে দাদু চাইল আমার দিকে।

'দেখব আবার কী বাছা? এই বন দেখেছি...শনশন করে বন, দিনরাত্তির শনশন, শীত গ্রীষ্মে শনশন... আর আমি, তা ওই গাছটার মতো, গোটা জীবন বনেই কাটালাম কিন্তু দেখলাম না কিছুই ... এখন তো কবরে যাবার সময়, মাঝে মাঝে মনে হয় বাছা, নিজে ভেবে কিছু ঠাহর হয় না; দুনিয়ায় আমি বেঁচে ছিলাম কি, নাকি না.... এই হল ব্যাপার! কে জানে হয়তো ছিলামই না....'

বনের ফাঁকাটায় ঘন গাছের মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে এল কালো মেঘের কিনার। প্রান্তের পাইনগাছের ডালগুলো বাতাসের ঝাপটায় দুলতে লাগল, একটা জলদগম্ভীর সঙ্গত তুলে আছড়ে পড়ল বন-গর্জন। দাদু মাথা তুলে কান পেতে শুনল।

খানিক পরে বলল, 'ঝড় আসছে। এ্যা-এ্যই, এটা আমি জানি। বাপরে, সারারাত ডাক ছাড়বে ঝড়, ডালপালা ভাঙবে, শেকড়সমেত উপড়ে ফেলবে গাছ... বনের মালিকের খেলা...' মৃদুস্বরে যোগ করল সে।

'তা জানলে কী করে দাদু?'

'হাঁ গো, এটা আমি জানি! গাছ কেমন কথা কয় সেটা ভালোই জানি... গাছেরও বাছা, ভয় ডর আছে ... এই তোমার অ্যাস্প গাছ, ভারি হারামজাদা গাছ, কেবলি কিছু একটা বকেই চলেছে— ঝড় নেই, বাতাস নেই, তবু ওটা ঠকঠকায়। ঝরঝরে দিন হল তো তোমার পাইনের কেমন ঝুমঝুমি, আর একটু ঝড় উঠতেই শুরু হবে তার গোঁ গোঁ গোঙানি। এ তো এখনো কিছুই নয়— ওই শোন এবার কান পেতে। চোখে ভালো দেখি না বটে, তবে কানে শুনি : ওই দ্যাখ ওকগাছের ডাক, মাঠের মধ্যের ওকগাছটাকেও ছুঁয়েছে তাহলে... কালবোশেখীর লক্ষণ।'

সত্যিই, মাঠের মাঝখানে পাইনবনের উঁচু দেয়ালের আড়ালে যে দরকচা মারা বেঁটে বেঁটে ওকগাছগুলো ছিল, সেগুলো বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়তে লাগল, সেখানকার চাপা আওয়াজটা পাইনবনের ঝোড়ো গর্জন থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়।

'ওই দ্যাখ, শুনছিস তো?' শিশুর মতো দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে বুড়ো, 'ও আমি জানি : ওকগাছগুলোও নাড়া দিয়েছে, তার মানে মালিক আসবে রাত্রে, ভাঙচুর করবে, তবে না, ওকগাছ ভাঙবে না, ওক হল শক্ত গাছ, মালিকেরও ক্ষমতা হবে না.... এই হল ব্যাপার।'

'মালিক আবার কোথায় দাদু? তুমি তো নিজেই বলছ, ঝড়ে ভাঙে।'

ধূর্তচোখে মাথা নাড়ল বুড়ো।

'হাঁ গো, এটা আমি জানি!... আজকাল, বলে, লোকে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। দ্যাখো কাণ্ড! কিন্তু আমি যে তাকে দেখেছি, এই তোকে যেমন এখন দেখছি, আরো ভালো করেই দেখেছি— এখন আমার যে বুড়ো চোখ, আর তখন ছিল জোয়ান চোখ। বাপরে, জোয়ানকালের চোখে আমি কীই-না দেখেছি!....'

'তা তাকে দেখলে কী করে দাদু, বলো না?'

'তবে শোন্, কী আর হবে, এই এখন যেমনটি তেমনি : প্রথমে গোঙাতে লাগে পাইনবন... এই ঝমঝম করে ওঠে, এই গোঙায় : ও-হু-হু-উ.... ও-হু-উ-উ-উ! তারপর নরম দেয়, তারপর ফের আবার, ফের আবার, আরো ঘন ঘন, আরো বেশি করে কাঁদে। হাঁ গো, কেননা মালিক তাদের অনেকগুলোকে পেড়ে ফেলবে রাত্রে। তারপর শুরু হয় ওকগাছের বুলি। সাঁঝের দিকে আরো জোর, আর রাতে শুরু হয় পাক দেওয়া, বন তোলপাড় করে ছোটে, হাহা করে হাসে, হুহু করে কাঁদে, ঘুরপাক দেয়, দুমদাম নাচে, কেবলি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকগাছের ওপর— ছারখার করতে চায়... আর আমি একবার শরৎকালে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম; এটা ওনার পছন্দ নয়কো। হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল জানলা পানে, দড়াম করে একেবারে পাইন ডালের বাড়ি; একটুর জন্যে আমার সারামুখ থেঁতলে যায়নি, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে, তবে আমাকেও বোকা পাওনি, সরে এসেছিলাম। হাঁ গো, ভারি রাগী বটে যে!...'

'আর দেখতে কেমন?'

'আর দেখতে বাপু, ওই তোমার বুড়োগাছটার মতো, জলায় যেটি আছে। ঠিক ওই রকম!... আর চুল তোমার ওই শুকনো আঁশের মতো, গাছের গায়ে যেগুলো জন্মায়, আর দাড়িও তাই, আর নাকটা তোমার এক মস্ত ডালের মতো, আর মুখখানা এবড়োখেবড়ো, ছাতা-পড়া। এ্যাহ!... কী বিচ্ছিরি! ভগবান করুন, কোনো মনিষ্যি যেন তেমন না হয়। বাপরে! আমি বাপু, আরো একবার তাকে দেখেছিলাম, জলায়, কাছ থেকে.... চাস তো চলে আসিস কোনো শীতকালে, নিজের চোখেই দেখবি। চলে যাস ওইখানে ওই টিলাটায়— গাছপালায় ঢেকে গেছে টিলাটা— গিয়ে চেপে বসিস কেন সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাবি। বনের মাথার উপর দিয়ে সাদা একটা কুণ্ডলী হয়ে সে হাঁটে, নিজে নিজেই এমন চক্কর দেয় যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে নিচের ডাঙায়। ছোটাছুটি করে, ছোটাছুটি করে, তারপর বনের মধ্যে উধাও হয়ে যায়... হাঁ গো!... আর যেখানেই যায়, পায়ের দাগ ঢেকে দেয় সাদা বরফ দিয়ে.... বুড়োর কথা বিশ্বেস না হয় নিজেই এসে একদিন দেখে যাবি।'

বকে চলল বুড়ো। মনে হল যেন বনের ঝঙ্কৃত সশঙ্ক আওয়াজ আর আকাশের জমকালো মেঘে তার বুড়ো রক্ত চনমন করে উঠেছে। মাথা নাড়ল বুড়ো, হাসল, মিটমিট করল তার বিবর্ণ চোখ।

কিন্তু হঠাৎ যেন তার বলিরেখাঙ্কিত কপালের উপর কী একটা ছায়া খেলে গেল। কনুই দিয়ে আমায় ঠেলা দিয়ে বুড়ো রহস্যের ভাব করে বলল :

'আর জানিস, বাছা, তোকে বলি শোন্ ... বনের এই মালিক হাঁ, বিদঘুটে অপদেবতা, তা ঠিক, অমন কদাকুচ্ছিতের মুখ দর্শনেও ঘেন্না হয় মনিষ্যির... তবে সত্যিকথাটাও বলা ভালো : লোকের ক্ষতি করে না বাপু। লোকের সঙ্গে মজা করে, রগড় করে— কিন্তু খারাপ কিছু একটা করল, তা করে না।'

'করে না কী দাদু, তুমিই তো বললে, তোমায় ডাল দিয়ে বাড়ি মারতে গিয়েছিল!'

'হাঁ গো, তা গিয়েছিল, গিয়েছিল রাগ হয়েছিল বলে, কেন আমি জানালা খুলে দেখতে গেছি, এই হল ব্যাপার! ওর ব্যাপারে নাক গলাতে না গেলে সে মানুষের কোনো কু করবে না। এই হল ওর ধরন। কিন্তু জানিস, বনে মানুষে যে দুষ্কম্ম করে সে বড় ভয়ানক ... হাঁ গো, বাপরে!'

বুড়ো মাথা নুইয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে যখন সে চাইল, তখন তার চোখের ঝাপসা পর্দাটা ভেদ করে যেন একটা সুপ্তোত্থিত স্মৃতির ঝলক দেখা গেল।

'শোন্ তবে তোকে বলি আমাদের বনের সাবেকি কথা। ব্যাপারটা হয়েছিল এখানেই, ঠিক এই ঠাঁইটিতে, ঢের দিন আগে.... মনে পড়ছে এখন, স্বপ্নের মতো, বনের ডাক যত বেড়ে ওঠে, ততই সব মনে পড়ে যায়.... শুনবি, ঘটনাটা বলব নাকি?'

'শুনব দাদু, শুনব, বলো।'

'তাহলে বলি, হ্যাঁ, শোন্ তবে।'

২

আমার মা-বাপ মারা যায় অনেক ছোটতেই, আমি তখনো এইটুকুন বাচ্চা... দুনিয়ায় আমায় একা ফেলেই চলে গেলেন গো। আমার তখন কী অবস্থা! লোকে ভাবে, "বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়?" জমিদারবাবুরও ভাবনা .... এই সময় বন থেকে এসেছিল বনের পাহারাদার রোমান, লোককে বলল, 'বাচ্চাটাকে আমায় দাও গো, ডেরায় নিয়ে যাই, মানুষ করব.... বনে আমারও খুশি লাগবে, ওরও অন্ন জুটবে....' এই কথা তো সে বলল, আর লোকেও জবাব দিল, 'তা নিয়ে যা!' নিয়েই গেল, সেই থেকেই তাই বনেই রয়ে গেলাম।

এখানে রোমানই আমায় মানুষ করল। উহ, কী ভয়ঙ্কর লোক বাপু, ভগবান করুন, অমন যেন কেউ না হয়! ... দশাসই চেহারা, কালো কালো চোখ, কালো মনটাও তার ঝিলিক দিত ওই চোখ দিয়ে, কেননা সারাজীবন মানুষটা একাই ছিল বনে : লোকে বলত, ভালুক তো ওর ভাইয়ের মতো, নেকড়ে— ভাইপো। যত রকমের জন্তু-জানোয়ার সব ওর চেনা, কাউকে ডরাত না, কিন্তু লোক দেখলে সরে থাকত, চেয়েও দেখত না.... এমনি মানুষ ছিল বাপু, বাপরে! আমার দিকে যখন তাকাত তো মনে হত যেন পিঠে লেজ বুলোচ্ছে বেড়াল ... তবে, যাই হোক, লোকটা ছিল ভালো, আমায় খাওয়ায়-পরায়, বলতে নেই, ভালোই। বাক হুইটের মণ্ড কখনো চর্বি ছাড়া হত না, আর হাঁস মারলে, হাঁস তো আছেই। সত্যি কথা সত্যিই। খাওয়াত যা হোক।

এমনি করেই থাকতাম দুজনে। রোমান চলে যেত বনে, আমায় বন্ধ করে রেখে যেত ঘরে, জন্তু-জানোয়ার যাতে না খায়। তারপর তার এক বউ হল, অক্সানা।

বউ জুটিয়ে দিল জমিদারবাবু। গাঁয়ে ডেকে পাঠাল তাকে, বলে কী, 'বলছিলাম রোমান বিয়ে কর!' জমিদারবাবুকে রোমান প্রথমে বলল, 'শালার আমার আবার বিয়ে! বনের মধ্যে মাগী নিয়ে আমি করব কী, এমনিতেই তো একটা বাচ্চা রয়েছে।' বলে, 'বিয়ের শখ নেই আমার।' মেয়ে-ফেয়ে ওর অভ্যেস নেই, এই হল ব্যাপার। কিন্তু জমিদারবাবুও সেয়ানা কম নয়... এই জমিদারবাবুর কথা যখন মনে হয় বাপু, তখন ভাবি, অমনধারা লোক আজকাল আর নেই, অমন জমিদার আর নেই, ওসব চলে গেছে ... এই তোকেই ধরি না কেন, বলে, তুইও নাকি জমিদারঘরের ছেলে... তা কথাটা হয়তো ঠিকই হবে, তবে তোর মধ্যে বাপু তেমন সেই যে বলে খাঁটি জিনিস নেই। এমনি ম্যাদামাড়া এক ছোকরা, তার বেশি কিছু নয়।

আর এটা ছিল খাঁটি জমিদার, সাবেক কালের... বলি শোন্ তোকে, দুনিয়ায় কী না হয়, একটা মানুষ, তার ভয়ে কিনা মরে শতেক লোক, ভয় বলে ভয়!... এই দ্যাখ না তোর চিল আর মুরগি : দুইয়েরই ডিম ফুটে জন্ম, চিলের ছানা কিন্তু অমনি উঠে যাবে আসমানে। হাঁ গো, ডাকবে কী! আর মুরগিছানা তোমার দূরের কথা, ধাড়ি মোরগটা পর্যন্ত কেবল ওই ডাঙাতেই ছোটাছুটি। এই চিল হল তোর জমিদার পাখি, আর মুরগি হল গিয়ে মামুলি চাষি....

এই যেমন মনে আছে, আমি তখন ছোট : বন থেকে মোটা কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনছে চাষিরা, লোক তোমার হবে জন-তিরিশেক। আর জমিদারবাবু একা আসছে তার ঘোড়ায়, মোচে তা দিচ্ছে। ঘোড়া নাচছে, আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে জমিদার। উরে বাপ্, জমিদারবাবুকে যেই-না দেখা, অমনি ছুটোছুটি লেগে গেল, শ্লেজসমেত ঘোড়াগুলো ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল বরফের মধ্যে, মাথার টুপি খুলে দাঁড়াল সবাই। পরে ঝামেলা কত, বরফ থেকে টানাটানি করে ফের তোলা হল গুঁড়িটাকে, আর জমিদারবাবু ওদিকে দিব্যি ঘোড়ায় চেপে। একা মানুষ আর রাস্তা ছেড়ে দিতে হল সবকটাকে। জমিদারবাবু ভুরু কোঁচকায়, চাষিরা ভয়ে মরে। হাসে, তো সবারই মন খুশি, মুখ ভার তো সবাই মন-মরা। আর জমিদারের কথা অমান্যি করবে, তেমন লোক ধরো, কেউ ছিল না।

আর এই রোমান তো বনেই বেড়ে উঠেছে সবাই জানে, মান্যিগণ্যি করে কীভাবে কথা কইতে হয় জানত না, জমিদারও তেমন রাগ করল না।

বলে, 'আমার ইচ্ছে তুই বিয়ে করবি আর কীজন্যে সেটা আমি দেখব। অক্সানাকে নে।'

রোমান বলে, 'আমার ইচ্ছা নেই গো, অক্সানাই হোক কি যেই হোক আমার দরকার নেই, করতে হয় শয়তান বিয়ে করুক গে, আমি নই... বোঝ একবার!'

চাবুক আনার হুকুম দিল জমিদার, রোমানকে শোয়ানো হল। জমিদারবাবু বলে :
'কী রোমান, বিয়ে করবি কি না?'
'না,' বলে, 'করব না।'
'দে ওকে ওর পাজামার উপর, যত পারিস।'
চাবুক পিটল কম নয়; ভারি তাগড়া শরীর ছিল রোমানের, তাহলেও বিরক্ত ধরে গেল বাপু।
বলে, 'নে থামা, তাই হোক গো! মাগী নিয়ে আমার ঝামেলা তো কম হবে না, চুলোয় গেলেই বরং ভালো। তা এনে দাও ওকে, বিয়েই করব।'
এখন জমিদারের বাড়িতে থাকত অপানাস শ্ভিদকি, শিকারি কুকুরের দেখাশোনা করত। রোমান যখন বিয়ের মত করেছে ঠিক সেই সময়টিতে সে এল মাঠ থেকে। রোমানের বিপদের কথাটা শুনল ও, ব্যস একেবারেই জমিদারের পায়ের উপর। পা জড়িয়ে ধরে কেবলি চুমু খায়...বলে, 'হুজুর দয়াবতার, মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কী হবে, বরং আমি বিয়ে করি অক্সানাকে, কথাটি কইব না ...'
হাঁ গো, নিজে থেকেই বলে বিয়ে করব। দ্যাখো কেমন মানুষ ছিল, বাপরে।
রোমানের আর আনন্দ ধরে না, উঠে দাঁড়িয়ে পাজামার ফিতে বেঁধে বলে :
'এ্যাই, এই তো ভালো কথা। তবে খানিক আগে এলেই তো হত গো। আর জমিদারবাবুও লোক বটে বাপু! চিরকালই অমনি! ... কে বিয়ে করতে রাজি সে কথাটা একবার জিগ্যেসাবাদ করে দেখতেও হয়। না তোমার হঠাৎ করে লোকটাকে ধরে লাগাও চাবুক।' বলে, 'খ্রিস্টধর্মে এমন করে নাকি কেউ। ছিঃ!...'
হাঁ বাপু, জমিদারকেও ও ছেড়ে কথা কইল না। দ্যাখো কেমন লোক ছিল বটে রোমান! একবার যদি রাগ হয়ে গেল, তো জমিদার হলেও ছাড়ান নেই। কিন্তু জমিদারবাবুটি ছিল তোমার সেয়ানা! মাথায় যে ওর অন্য মতলব। ফের হুকুম দিল ঘাসের উপর শোয়াও রোমানকে।
বলে, 'আমি কিনা তোর সুখের ব্যবস্থা করছি হারামজাদা, আর তুই নাক ওলটাস। থাকিস তুই একা, গুহার মধ্যে ভালুকের মতো, তোর ওখানে লোকে যেতেই চায় না... হারামজাদাটাকে আচ্ছা করে লাগা, যতক্ষণ-না শায়েস্তা হচ্ছে। আর তুই, অপানাস— ভাগ শিগগির হারামজাদা। নেমন্তন্ন নেই, টেবিলে এসে বসার শখ,' বলে, 'সেটি চলবে না। নইলে দেখছিস কেমন উত্তমমধ্যম খেল রোমান? তোর ভাগ্যেও না জোটে!'
আর রোমানেরও ওদিকে রাগ হয়ে গেল কম নয়। হাঁ গো! চাবুক চলছে মিঠেকড়া, কেননা, সাবেকি লোক তো, চাবুক মেরে চামড়া তুলে নিতে ভালোই জানত, আর রোমান ওদিকে শুয়ে আছে তো আছেই, টুঁ শব্দ করেও বলে না : হয়েছে গো, থামাও। অনেকক্ষণ সহ্য করে রইল, তাহলেও শেষপর্যন্ত থুতু ফেলে বলল :

'শালীর বাপের আর তর সয় না, মারলে বটে খ্রিস্টান মানুষটাকে, গোণাগুন্তি নেই। নাও গো, হয়েছে! বাবুর ঘরের চাকরদের হাত জিরোক! চাবুক চালাতে শিখেছে বটে! পিটল কী, যেন খড় ঝাড়াই! এই যখন তোমার অবস্থা, তখন হাঁ বলছি, বিয়েই করব।'

ওদিকে জমিদারবাবু তখন হাসতে লেগেছে।

বলে, 'এই তো খাসা! বিয়ের ভোজে ঠেস দিয়ে বসাটিও তোর আর চলবে না ঠিক, তবে ধেই নাচ নাচতে পারবি বেশি...'

রগুড়ে ছিল বটে বাপু, তোমার ওই জমিদার, হাঁ গো, রগুড়ে বটে। তবে পরে ভারি কাহিল দশা হয় জমিদারের, ভগবান করুন কোনো খ্রিস্টানের যেন তা না হয়। সত্যি গো, কারু যেন তেমন না হয়। ঘোর শত্তুরেরও তেমন হোক চাই না। এই আমি বলি ...

তারপর রোমানের তো বিয়ে হল। বউটিকে সে নিয়ে এল তার ঘরে। প্রথম প্রথম খুব গালমন্দ করল, বলল, তোর জন্যেই চাবুক খেলাম।

বলে, 'তোর জন্যে যত কষ্ট পেয়েছে মানুষে, তুই তার তুল্যি নস।'

বন থেকে ফিরত, ফিরেই তাড়িয়ে দিত ঘর থেকে :

'বেরো বলছি, ঘরে আমার মাগীর দরকার নেই। মুখ যেন তোর দেখতে না হয়!' বলে, 'ঘরের মধ্যে মাগী ঘুমুচ্ছে সইতে পারি না।' বলে, 'গন্ধটাই কেমন বিদঘুটে।'

হাঁ গো!

তবে পরে, তেমন কিছু নয়, সয়ে গেল। অক্সানা ঘরদোর ঝাঁট দিত, সাফসুফ করত, বাসনকোসন গুছিয়ে রাখত, সবকিছুই ঝকঝকে তকতকে, মনটা পর্যন্ত কেমন ভালো হয়ে ওঠে। রোমান দেখে, মাগী মন্দ নয়, একটু একটু করে অভ্যেস হয়ে যায়। আর অভ্যেস নয়, ছেলে, পীরিত পর্যন্ত করল, ভগবান সাক্ষী, মিথ্যে বলব না। দ্যাখো, কেমন ব্যাপার হল রোমানের। বউকে যখন ভালো চোখে দেখতে লাগল, তখন বলে কী :

'কৃতার্থ যাই বাপু জমিদারকে, উপকারই করেছে। কী মুখ্যু ছিলাম গো, কত চাবুক খেয়েছি, এখন দেখছি, খারাপ কিছু নয়। বলতে কী, তা ভালোই বটে। দ্যাখো কাণ্ড!'

তারপর কিছুদিন তো কাটল, কতদিন তা বাপু বলতে পারব না। মাচার উপর শুল অক্সানা, কোঁথাতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা খারাপ হল, আর সকালে ঘুম ভেঙে শুনি কে যেন সরু গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। ভাবলাম : আরে, এ যে দেখছি ছেলে হয়েছে। আর সত্যিই তাই।

দুনিয়ায় বেশিদিন রইল না ছেলেটা। বেঁচে রইল কেবল সকাল থেকে সন্ধ্যাটি পর্যন্ত। সন্ধ্যায় চিঁচিঁ করাও বন্ধ হল.... অক্সানা কাঁদাকাটি করে আর রোমান তাকে বলে :

'ছেলেটা তো আর রইল না, আর রইল না যখন, তখন পাদরি ডেকে কী হবে, পাইনগাছের নিচে গোর দেব।'

এই তো বলল রোমান, আর বলল শুধু নয়, তাই করল; ছোট্ট একটা কবর খুঁড়ে গোর দিল। ওই জায়গাটায় এখন একটা বুড়ো গুঁড়ি আছে, ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল গাছটা.... তা ভাঙলই-বা, যেখানে গোর দিয়েছিল ওটা সেই গাছ। আর জানিস ছেলে, বলি শোন্, আজো পর্যন্ত যেই সূয্যি ডোবে, বনের উপর গ্রহ তারা ফুটে ওঠে, অমনি কী একটা পাখি উড়ে আসে ওখানে আর ডাকে। ওহ্ কী যে কেঁদে কেঁদে ডাকে পাখিটা, টনটন করে ওঠে বুক। এটা হল ওর ওই আত্মাটা, পাদরির হাতে খ্রিস্টদীক্ষা হয়নি তো, সেই খ্রিস্টশুদ্ধি চায়। লোকে বলে, যারা জানে-শোনে, শাস্ত্রটাস্ত্র পড়েছে, তারা যদি খ্রিস্টশুদ্ধি দেয় তাহলে আর উড়ে উড়ে আসবে না। তা বাপু আমরা এই বনেই থাকি, কিছুই তো জানাশোনা নেই। পাখিটা উড়ে আসে, মিনতি করে, আর আমরা কী করি, শুধু বলি, 'বালাই, বালাই! আমরা কিছু করতে পারব না গো, আহা বেচারি!' আর কাঁদে পাখিটা, উড়ে যায়, ফের উড়ে আসে। হায় গো, কী বলব ছেলে, কষ্ট হয় ভারি।

অক্সানা তো ভালো হয়ে উঠল, কিন্তু কেবলি যেত কবরটার কাছে। কবরের কাছে বসে বসে কাঁদত, এমন ডাক ছেড়ে কাঁদত যে তোমার সারা বনে তার আওয়াজ যেত। তবে ছেলের জন্যে যত দুঃখু সে কেবল ওরই, ছেলের জন্যে রোমানের কিন্তু কষ্ট হত না, কষ্ট হত অক্সানার জন্যে। বন থেকে ফিরে আসত, অক্সানার কাছে গিয়ে বলত :

'চুপ কর বউ, ভারি অবুঝ তুই! কাঁদবার কী হয়েছে। একটা ছেলে মারা গেছে, তা আবার হবে। কে জানে, হয়তো আরো ভালোই হবে। হ্যাঁ গো! আর এইটে হয়তো, বলা যায় না, আমার ছেলেই নয়, আমি তো আর ঠিক জানি না, তবে লোকে বলে ... তবে পরেরটা আমারই হবে।'

কিন্তু এরকম কথা বললে অক্সানার ভালো লাগত না। কান্না থামিয়ে গালমন্দ করে খেঁকিয়ে উঠত। রোমান কিন্তু রাগ করত না।

বলত, 'খেঁকিয়ে উঠছিস কেন বউ। আমি তো খারাপ কিছু বলিনি, কেবল বলেছি, আমি ঠিক জানি না। কারণ, সত্যিই তো জানি না। আগে তুই আমার বউও ছিলি না, বনেও থাকতিস না। ছিলি ঘরসংসারে, লোকজনের মধ্যে। জানব কী করে? আর এখন তুই বনে আছিস, এখন ভাবনা কী! আর ও-কথাটা আমায় বলে ওই মাগী ফেদসিয়া, যখন গাঁয়ে গিয়েছিলাম ওর ঘরে। বলে, "কী ব্যাপার বল্ তো রোমান, এত তাড়াতাড়ি ছেলে বিয়োল যে?" বললাম, "তাড়াতাড়ি কি দেরি, তা আমি জানব কোত্থেকে গো?" আর তুই বাপু, চিল্লানি থামা, নইলে রাগ হয়ে যাবে আমার, বলা যায় না, মেরেই না ফেলি।'

অক্সানা খেঁকোয় খেঁকোয় তারপর থামে।

অক্সানা গালমন্দ করত, পিঠে কিলঘুষি মারত আর রোমান যেই নিজেই রেগে উঠত অমনি ভয়ে চুপ করে যেত সে, আদর করত তাকে। গলা জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত, চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকত.... রোমানও অমনি গলে যেত.... কারণ, জানিস ছেলে ... তুই আর জানবি কী করে, কিন্তু আমি বুড়ো, বিয়ে-থা না করলেও জীবনে অনেক দেখেছি তো : সোমত্ত মাগী, এমন মধু ঢেলে চুমু খেতে পারে গো, যে তোমার যত বদরাগী মরদই হোক, বশ করে ফেলবে। উরে বাপ! আমি যে ওদের জানি গো, কেমন মাগী সব। আর অক্সানা ছিল এমন ডবকা, নধর মাগী গো, যে তেমন আজকাল আর চোখে পড়ে না। আজকাল, তোকে বলি ছেলে, আগের মতো তেমন মাগীও আর নেই কো।

একবার বনে তো শিঙা বেজে উঠল : ত্রাতা, তারা-তারা-তা তা-তা! সারা বন জুড়ে কী গমগমে ফুর্তির আওয়াজ! আমি তখন ছিলাম বাচ্চা, কীসের আওয়াজ জানতাম না। দেখি: বাসা ছেড়ে মাথা তুলছে পাখি, ডানা ঝাপটে ডেকে উঠছে, কোথাও আবার পিঠ বরাবর কান নেতিয়ে লাফিয়ে উঠছে খরগোশ, প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। ভাবলাম, অচেনা কোনো জানোয়ারই বোধহয় অমন সুন্দর করে ডাকছে। আসলে জানোয়ার নয়কো, জমিদারবাবু বনে এসেছে ঘোড়ায় চেপে, শিঙে বাজাচ্ছে; জমিদারবাবুর পেছনে ঘোড়ায় চেপে লস্কররা, কুকুর ছুটছে। লোকলস্করদের মধ্যে সবচেয়ে দেখতে খাসা অপানাস শ্ভিদকি, গায়ে নীল উর্দি, জমিদারের পেছনে পেছনে ঘোড়া নাচাচ্ছে। মাথার টুপিতে সোনালি চুড়ো। কাঁধের পেছনে ঝকঝক করছে বন্দুক, কাঁধ থেকে বেল্ট ঝুলছে, তাতে বান্দুরা। অপানাসকে পেয়ার করত জমিদার, কেননা অপানাস বান্দুরা বাজাত ভালো আর গান গাইত খাসা। আর দেখতে কী সুন্দর ছিল এই অপানাস, ডাকসাইটে সুন্দর। অপানাসের কাছে জমিদার একেবারে দাঁড়াতে পারে না। জমিদারের মাথায় তখন টাক পড়েছে, নাক হয়ে উঠেছে লালচে, আর চোখ দুখানা ফুর্তিবাজ হলে কী হয়, অপানাসের মতন নয়। অপানাস যদি ধর আমার পানেই তাকাল, আমি বাচ্চা ছোঁড়া, আমারও কেমন হাসতে মন হত, অথচ আমি তোমার মেয়ে নইকো। লোকে বলে, অপানাসের বাপ-দাদুরা হল জাপরোজিয়ের কসাক, 'সেচ'-এ ডেরা পেতেছিল, আর সেখানকার লোকজন সব যেমন নধর, তেমনি সুপুরুষ, তেমনি তোমার চটপটে। তুই ছেলে নিজেই ভেবে দ্যাখ, মাঠ ডাঙায় বর্শা নিয়ে পাখির মতো ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া আর তোমার কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটা, এ তো আর সমান কথা নয় ....

আমি তো ঘর থেকে ছুটে গিয়ে দেখি : জমিদার আসছে, থামল জমিদার, লস্কররা দাঁড়াল; রোমানও বেরুল ঘর থেকে, রেকাব ধরল গিয়ে, জমিদারবাবু নামল। কুর্নিশ করল রোমান।

'ভালো আছিস তো,' জমিদারবাবু বলল রোমানকে।

'আজ্ঞে হাঁ,' রোমান বলে, 'আমি তো বাবু আপনাদের দয়ায় ভালোই আছি, তাছাড়া আর থাকব কী। কিন্তু আপনি কেমন গো?'

দেখছিস তো, জমিদারের কাছে ন্যায্যমতো কথা কইতেও জানত না রোমান। তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। জমিদারবাবুও হাসল।

'তা তুই ভালোই আছিস যখন, ভগবানকে ধন্যবাদ, কিন্তু তোর বউ কোথায়?' বলে জমিদার।

'বউ আবার থাকবে কোথায়? ঘরেই আছে গো....'

'তাহলে আমরা ঘরেই যাই', জমিদার বলে, 'আর তোরা ততক্ষণে ঘাসের উপর গালিচা পাত, সবকিছু জোগাড়যন্ত্র করে ফেল, বরকনেকে আশীর্বাদ করতে হবে।'

ঘরেই এল গো, জমিদার আর অপানাস, পেছু পেছু টুপি খুলে রোমান, আর আরো একজন বগদান, হেড বরকন্দাজ, জমিদারের বিশ্বাসী চাকর। অমন চাকরও আজকাল আর দুনিয়ায় দেখি না : বুড়ো ছিল লোকটা, লোকজনের কাছে যেমন কড়া, জমিদারের কাছে আবার তেমনি একেবারে কুকুর। সংসারে তার কেউ ছিল না, শুধু ওই জমিদার। লোকে বলে, বগদানের মা-বাপ যখন মারা যায়, তখন সে বুড়ো জমিদারের কাছে বলে : কর নজরানা যা দেবার সে দেবে, চাকরি করবে না, বিয়ে করতে চায়। বুড়ো জমিদার অনুমতি দেয় না, তার ওপর জমিদারের ব্যাটার ভার দিয়ে সে বলে : এই হল তোর বাপ, এই তোর মা, এই তোর বউ। তাই জমিদারের ব্যাটাকেই গড়েপিটে তোলে বগদান, তাকে ঘোড়ায় চাপা শেখায়, বন্দুক ছুড়তে শেখায়। বড় হয়ে উঠল ছেলে, নিজেই হল জমিদার, বুড়ো বগদানও ওদিকে কুকুরের মতো আছেই তার পিছু পিছু। ওহ, সত্যি বলছি তোকে, লোকে কত শাপমন্যি করেছে বগদানকে, কত লোককেই চোখের জল ফেলতে হয়েছে ... সবই জমিদারের জন্যে। জমিদারের একটি কথায় সে বলতে কী, নিজের বাপকেই কেটে টুকরো টুকরো করতে রাজি....

আর আমি ছোটছেলে, আমিও ওদের পেছু পেছু ঢুকলাম ঘরে : না, কী হয় দেখি— একটা কৌতূহল গো। জমিদার যেদিকে ফেরে, আমিও ঠিক তার পেছু পেছু।

দেখি, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জমিদার, মোচে তা দিচ্ছে, হাসছে। রোমানও সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের টুপিটি দলামোচড়া করছে। আর অপানাস বেচারি দেয়ালে ঠেস দিয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে তোমার ওই সামনের জোয়ান ওকগাছটির মতো। ভুরু কোঁচকানো, মুখ ভার ...

তিনজনই ফিরল অক্সানার দিকে। শুধু বুড়ো বগদান বসে রইল কোণটিতে, বেঞ্চির উপর, ঝুঁটি নামিয়ে বসে রইল জমিদারের কিছু একটা আজ্ঞা না হওয়া পর্যন্ত। আর অক্সানা দাঁড়িয়ে ছিল চুল্লির কাছের কোণটিতে, চোখ নামিয়ে রেখেছে মাটির দিকে, সর্বাঙ্গ রাঙা হয়ে উঠেছে, তোমার ওই যবগাছগুলোর মধ্যিখানের পপিফুলটার মতো। হাই গো! দেখেই বোঝা যায়, অভাগী বুঝেছে, ওকে নিয়েই

সর্বনাশ হবে। তোকে, ছেলে, বলে রাখছি, তিনটে মরদ যদি একটা মাগীর দিকেই চোখ দেয়, তবে তা থেকে ভালোকিছু কখনো হয় না, চুলোচুলি পর্যন্ত গড়াবে, যদি না তোমার আরো খারাপ কিছু হয়। এ আমি জানি গো, কেননা, স্বচক্ষে দেখেছি।

জমিদার হেসে বলে, 'কী রে রোমান, বউটি তোর ভালোই জুটিয়ে দিয়েছি বল্?'

রোমান বলে, 'তা বলবার কী আছে গো, মাগীটা তোমার যেমন হয় তেমনি, চলে যাবে!'

তা শুনে অপানাস কাঁধ ঝাঁকাল। অক্সানার দিকে চেয়ে মনে মনেই বলে : 'হ্যাঁ, তা মাগীই বটে! তবে অমন হাঁদার কপালে না জুটলেই ভালো হত।''

কথাটা রোমানের কানে গেল, অপানাসের দিকে ফিরে বলে :

'কিন্তু আমি বাবু তোমার কাছে হাঁদা হলাম, কেন বলো দেখি?'

'নিজের বৌকে তুই আগলে রাখতে পারিস না বলে হাঁদা।'

দ্যাখো তোমার কী কথা বলে দিল অপানাস। জমিদারবাবু পর্যন্ত পা ঠুকল, বগদান মাথা নাড়ল, আর রোমান একদণ্ড ভেবে মাথা তুলে তাকাল জমিদারের দিকে।

'আগলে রাখার কী আছে?' কথাটা বলছে অপানাসকে, আর নিজে তাকিয়ে থাকছে কেবল জমিদারের দিকে, 'এখানে আছে তো তোমার জন্তু-জানোয়ার, তাছাড়া ভূতেও দেখা দেয় না কখনো, দয়াবতার হুজুরও কি আর আসেন কখনো। বউকে আগলে রাখতে হবে কার কাছ থেকে? তোকে বলে রাখছি শালা কসাক, আমায় রাগাস না, নইলে তোর ঝুঁটি চেপে ধরব কিন্তু।'

তা তোমার ব্যাপারটা ওইরকমই গড়াত, কিন্তু জমিদার থামিয়ে দিল, পা ঠুকতেই সবাই চুপ করে গেল।

বলে, 'চুপ কর বলছি, ঝগড়ুটে খোকা সব! মারপিটের জন্যে এসেছি নাকি? বর-বউকে আশীর্বাদ করতে হবে, তারপর সন্ধের দিকে শিকার করতে যাব জলায়। এসো সব আমার সঙ্গে।'

জমিদার বেরিয়ে এল ঘর থেকে; গাছের তলে লস্কররা ততক্ষণে খাবারদাবার গুছিয়ে রেখেছে। জমিদারের পেছু পেছু গেল বগদান, অপানাস কিন্তু রোমানকে থামাল বার-বারান্দায়।

বলে, 'আমার ওপর রাগ করিস না ভাই, অপানাসের কথাটা ভালো করে শোন্: দেখেছিলি তো জমিদারের পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, জুতোয় পর্যন্ত চুমো দিয়েছিলাম অক্সানাকে পাবার জন্যে। তা ভগবান তোকে দেখবেন, পাদরি তোর বিয়ে দিল, বোঝাই যাচ্ছে এই নির্বন্ধ। তাই বলি, তোর বউকে নিয়ে, তোকে নিয়ে পাজিগুলো হাসাহাসি করবে এ আমি সইতে পারি না। উহ্! আমার বুকের মধ্যটায় যে কী

হচ্ছে কেউ জানে না.... বিছানায় আজ ওদের শুতে হবে না, জমিদার আর অক্সানা দুজনকেই গুলি মেরে শোয়াব কাঁচা মাটিতে।

রোমান কসাকের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল :

'তোর মাথা খারাপ হয়নি তো, কসাক?'

জবাবে বার-বারান্দায় ফিসফিস করে অপানাস কী বলল সেটা আমি শুনিনি, শুধু রোমান তার কাঁধে কীভাবে চাপড় দিল সেইটে কানে এল।

'ওহ্ অপানাস! কী শয়তান, পাষণ্ড লোকই-না আছে সংসারে! আমি বনবাসী, কিছুই তো জানতাম না এসব। এহ্ জমিদারবাবু, যেচে তুই নিজের মাথায় বিপদ ডাকলি! ...'

অপানাস বলে, 'নে ভাগ এবার, কিছু ফাঁস করিস না, বিশেষ করে বগদানের কাছে। তুই লোকটা মাথামোটা, আর জমিদারের এই কুকুরটা ভারি সেয়ানা। দেখিস কিন্তু : জমিদারের মদ বেশি খাস না, আর তোকে যদি লস্করদের সঙ্গে জলায় পাঠায় আর জমিদার নিজে এখানে থেকে যায়, তাহলে লস্করদের তুই নিয়ে যাবি বুড়ো ওকগাছটার কাছে, ঘুরপথটা তাদের দেখিয়ে দিবি, আর বলবি, তুই নিজে যাচ্ছিস বনের মধ্যে ... চটপট ফিরে আসবি এখানে।'

রোমান বলে, 'ঠিক আছে। শিকারেই যাব, বন্দুকই ঘাড়ে নেব, ভরব পাখি মারার ছররা নয়, ভালুকমারা গুলি।'

চলে গেল ওরা। জমিদার ওদিকে বসেছে গালিচায়। হুকুম দিল পাত্র পেয়ালা দিতে, পেয়ালায় কড়া মদ ঢেলে আপ্যায়ন করল রোমানকে। হাঁ গো, জমিদারের যেমন পাত্র তেমনি পেয়ালা, আর মদ তো আরো খাসা। এক পেয়ালা খেলেই মেজাজ শরিফ, দুই পেয়ালাতে বুকের মধ্যে উথালপাথাল, আর তেমন অভ্যেস না থাকলে তিন পেয়ালাতেই মেঝেয় গড়াগড়ি— যদি তোমার বউ এসে চৌকিতে না শোয়ায়।

হাঁ গো, বলছি তোকে ছেলে, জমিদার ছিল ভারি সেয়ানা। ভেবেছিল রোমানকে মদ খাইয়ে মাতাল করবে, কিন্তু রোমান টলে পড়বে তেমন মদ পাবে কোথায়। জমিদারের হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে খাচ্ছে রোমান, দু পেয়ালা খেল, তিন পেয়ালা খেল, শুধু চোখদুটো ওর জ্বলতে লাগল নেকড়ের মতো, কালো কালো মোচ কাঁপাতে লাগল। জমিদার পর্যন্ত চটে উঠল :

'দ্যাখো কেমন হারামজাদার ব্যাটা, চোঁ চোঁ মদ টানছে, চোখের পাতাটিও নড়ছে না। অন্যে হলে এতক্ষণ কান্না জুড়ত, আর দ্যাখো তোমরা ভালোমানুষেরা, ও এখনো হেসেই চলেছে ...'

জমিদার ব্যাটা তো ভালোই জানত, গোরিলকা খেয়ে লোকে যদি কাঁদতে শুরু করে, তবে আর ভাবনা নেই, শিগগিরই টেবিলের উপর মাথা ঠুকে টলে পড়বে। এবার কিন্তু সেটি হল না।

'তা আমার আবার কাঁদবার কী আছে,' রোমান জবাব করে, 'সেটা, বলবে কী, ভালো দেখায় না গো। দয়াবতার জমিদার এলেন আমার ঘরে আশীর্বাদ করতে, আর আমি কিনা কান্না জুড়ব মাগীর মতো। ভগবানের দয়ায়, কান্নার কিছু নেই আমার, কাঁদতে হয় আমার শত্তুরে কাঁদুক....'

জমিদার বলে, 'তাহলে আনন্দেই আছিস।'

'হাঁ গো, আনন্দে না থাকার কী আছে?'

'আর মনে আছে, কীরকম চাবুক কষে তোর বিয়ে দিয়েছিলাম?'

'মানে থাকবে না কেন গো! সেই কথাতেই তো বলি, বোকা হাঁদা ছিলাম গো, তেতো-মিষ্টি জানতাম না। চাবুক দেখো কেমন কড়া জিনিস, আর মাগী ছেড়ে আমি চাবুকই চেয়েছিলাম। কৃতার্থ যাই আপনার কাছে গো, দয়াবতার জমিদার, হাঁদাটাকে শিখিয়ে দিলেন বটে যে দুনিয়ায় মধুও আছে।'

'হয়েছে, হয়েছে', জমিদার বলে, 'তাহলে তার জন্যে আমায় কাজ করে দে এখন। লস্করদের সঙ্গে চলে যা জলায়, বেশকিছু পাখি মেরে আন্, একেবারে তিতির পাখি আনা চাই কিন্তু।'

'কিন্তু জমিদারবাবু আমাদের জলায় পাঠাচ্ছেন, সময়টা একবার দেখুন?' জিগ্যেস করে রোমান।

'আরো কিছুটা মদ খাওয়া যাক, অপানাস গান শোনাবে তারপর চলে যাবি ভগবানের নাম নিয়ে।'

অপানাসের দিকে তাকিয়ে দেখে রোমান জমিদারকে বলে :

'এখনই বাবু কাজটা সহজ নয়, বেলা তো নেই, জলা পর্যন্ত যেতেও অনেকটা। ওদিকে বনে হাওয়ার ডাক দেখুন, ঝড় উঠবে রাতে। অমন হুঁশিয়ার পাখি এখন মারব কী করে?'

জমিদারের ততক্ষণে একটু নেশা হয়েছে, নেশায় রাগ চড়ে যায় তো! কানে এল, লোক-লস্কররা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে, বলছে কী : 'হাঁ, রোমান ঠিকই বলেছে, শিগগিরই ঝড় ডাকবে', শুনে রেগে গেল জমিদার। ঠকাম করে পেয়ালা ঠুকল, চোখ কটমট করে তাকাল— সবাই চুপ করে গেল।

শুধু ভয় পেল না একা অপানাস। জমিদারের হুকুমমতো সে এগিয়ে এল বান্দুরা নিয়ে, বান্দুরার তার বাঁধে আর ঘাড় বেঁকিয়ে জমিদারের দিকে চেয়ে বলে :

'ভেবে দেখুন, হুজুর! একে রাত, তাতে ঝড়, তার মধ্যে আঁধারে বনের পাখি তাড়া করছে লোকে, এ কে কবে শুনেছে, হুজুর?'

দ্যাখ কেমন সাহস ছিল লোকটার। অন্যে সবাই তো জমিদারের বাঁধা গোলাম, ভয়ে মরে, আর এটা স্বাধীন বেপরোয়া লোক, কসাক রক্ত। ইউক্রেন থেকে তাকে বাচ্চাবয়সে নিয়ে এসেছিল এক বুড়ো কসাক, বান্দুরা-বাজিয়ে। সেখানে জানিস ছেলে, উমান শহরে কী একটা হৈহাঙ্গামা লাগে। ব্যস, বুড়ো

কসাককে ধরে তার চোখ গেলে কান কেটে ছেড়ে দেয় দীন দুনিয়ায়। তারপর হেঁটে হেঁটে সে শহরগ্রাম ঘুরে বেড়ায়, আমাদের এলাকাতে এসে পৌঁছয় ওই অপানাস ছোঁড়ার হাত ধরে। বুড়ো জমিদার তাকে আশ্রয় দিয়ে রাখে, কেননা গান শুনতে ভালোবাসত। বুড়ো মরলে, অপানাস বেড়ে উঠল জমিদারবাড়িতে। নতুন জমিদারও ভালোবাসত তাকে, এমন কথাও তার সয়ে যেত, যার জন্যে অন্য লোকের চামড়া যেত পিঠের।

এবারও তাই হল : প্রথমটা চটে উঠল জমিদার, সবাই ভাবল এই বুঝি মারে কসাকটাকে, পরে কিন্তু বলল :

'বটে, অপানাস! ছোকরা তুই চালাক চতুর, তবে জানিস না যে দুই কপাটের মাঝখানে নাক গলাতে নেই, থেঁতলে যেতে পারে...'

দ্যাখো কেমন আন্দাজ করল বটে! কসাকও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল। জমিদারের জবাব সে দিল গানের মধ্যে। ওই গো! জমিদারও যদি কসাকের সে গান বুঝত, তবে হয়তো-বা রানিমাকে এমন করে চোখের জল ফেলতে হত না।

অপানাস বলল, 'জ্ঞান বুদ্ধি শেখালেন হুজুর, কৃতার্থ যাই, তার বদলে আমি একটা গান ধরছি, শুনে দেখুন।'

বলে বান্দুরার তারে ঝঙ্কার দিল।

তারপর মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল আকাশের দিকে, ঈগল পাক দিচ্ছে আকাশে, হাওয়ায় ছুটছে কালো মেঘ। কান পেতে শুনল, ডাক ছাড়ছে পাইনগাছ।

আবার ঝঙ্কার দিল তারে।

ওহ্ কী বলব ছোঁড়া, অপানাস শ্ভিদকি যে কীরকম বাজাল তা শোনার কপাল হয়নি তোর, আর এখন তো আর সে আশাই নেই! সাদামাটা জিনিস তোমার বান্দুরা, কিন্তু তেমন লোকের হাতে পড়লে কথা কয় কেমন। আঙুল ছুটবে আর সবকিছু শোনাবে বান্দুরা, বাদলা দিনে কেমন করে ডাকে আঁধার বন, ফাঁকা স্তেপে ঝোপঝাড়ে কেমন শনশনিয়ে যায় বাতাস, কসাকের ঢিপ-কবরে কেমন করে খসখসিয়ে ওঠে শুকনো ঘাস।

না গো ছেলে, তেমন খাঁটি বাজনা আজ আর শুনবি না! আজকাল তোমার কত সব লোক এসে-যাচ্ছে দ্যাখো, শুধু এক পোলেসিয়ে থেকে নয়, নানান জায়গার লোক, সারা ইউক্রেনের লোক, তোমার চিগিরিনের লোক, পলতাভার লোক, কিয়েভের লোক, চেরকাশের লোক। বলে, বান্দুরা-বাজিয়েরা আর নেই, হাটে-বাজারে, মাঠে-মেলায় তাদের গান আর শোনা যায় না। আমার ঘরের দেয়ালে এখনো একটা পুরনো বান্দুরা টাঙানো আছে; বাজাতে শিখিয়েছিল আমায় অপানাস, কিন্তু আমার কাছ থেকে আর কেউ শিখল না। যখন মরব, সেদিন তো আর দূরে নয়, তখন এই গোটা দুনিয়ার কোথাও আর বান্দুরার আওয়াজ উঠবে না। এই হল গে বৃত্তান্ত!

মৃদু গলায় গান গাইল অপানাস। অপানাসের গলাটা চড়া নয়, উদাস উদাস গলা, যেন বুকের মধ্যে গলে যাচ্ছে। আর এই গানটা ছেলে, বোঝা গেল, ও কসাক নিজেই বানিয়েছে জমিদারের জন্যে। সে গান আমি তার আগেও কখনো শুনিনি, পরেও কখনো শুনিনি; পরে অপানাসকে যদি-বা কখনো গাইতে বলেছি, ও কিছুতেই রাজি হয়নি।

বলে, 'যার জন্যে ও গান গেয়েছিলাম, সে আর সংসারে নেই।'

এই গানের মধ্যে কসাক সব কথাই খুলে বলল জমিদারকে, কী তার কপালে আছে; আর জমিদারও কাঁদে, মোচ বেয়ে তার চোখের জল গড়ায়, কিন্তু বোঝাই যায়, গানের একটি কথাও সে বোঝেনি।

হায় গো, গানটা আর আমার মনে নেই, শুধু খানিকটা মনে আছে।

কসাক গান গেয়ে শোনাল ইভানের নাম করে :

হায় গো রাজা, হায় ইভান!...
কত বুদ্ধি কত-না জ্ঞান ...
জানেন রাজা আকাশে কার জয়,
চিলের কাছে কাকের পরাজয় ...
হায় গো রাজা, জানো না সেকি
এ দুনিয়ায় ঘটে কত কী—
কাকের বাসায় চিলেরই প্রাণ যায়...

কী জানিস ছেলে, এখনো যেন এ গানটা আমার কানে বাজে, লোকগুলো সব চোখে ভেসে ওঠে : কসাক দাঁড়িয়ে আছে বান্দুরা নিয়ে, জমিদারবাবু বসে আছে গালিচায়, মাথা নিচু করে কাঁদছে; চারিদিকে লোকজন সব ভিড় করেছে, কনুই দিয়ে ঠেলাঠেলি করছে; মাথা নাড়ছে বুড়ো বগদান ... আর বন ঠিক এখনকার মতোই শনশন করছে, গুমরে গুমরে বাজছে বান্দুরা, আর কসাক গেয়ে চলেছে কেমন করে রাজরানি কাঁদছেন ইভান রাজার জন্যে :

কাঁদেন রানি, নয়নে জল ঝরে,
ইভান রাজার ওপরে কাক ওড়ে।

আহ্ গো, জমিদারবাবু বুঝলে না গানটা, চোখের জল মুছে বললে :

'নে রোমান, যা এবার! ওহে তোমরা সব ঘোড়ায় চেপে বসো! আর তুই অপানাস, তুইও যা ওদের সঙ্গে ... তোর গান শুনে আর কাজ নেই!.... গানটা ভালোই, তবে গানের ওই যে কথাগুলো তা দুনিয়ায় কখনো হয় না।'

গান গাইতে গাইতে কসাকের মনটা নরম হয়ে এসেছিল, চোখ ঝাপসা।

বলে, 'কী বলছেন হুজুর, আমাদের এলাকার বুড়োরা বলে : সত্যি আছে কাহিনীতে, সত্যি আছে গানে। তবে কাহিনীর সত্যি হল লোহার মতো : অনেক

দিন সংসারে লোকের হাতে হাতে ফিরে মরচে ধরা ... আর গানের সত্যি— সোনার মতো, কখনো তাতে মরচে ধরে না... বুড়োরা তো তাই বলে।'

জমিদার হাত নেড়ে থামিয়ে দিল।

'হয়তো তোদের এলাকায় বলে, আমাদের এদিকে নয় ... নে তো, যা এবার অপানাস, বিরক্ত ধরে গেল তোর কথা শুনতে শুনতে।'

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কসাক, তারপর হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল জমিদারের পায়ের কাছে।

'আমার কথা শুনুন হুজুর, ঘোড়ায় চেপে চলে যান গিন্নিমার কাছে : মনটা আমার কু গাইছে।'

শুনেই রেগে গেল জমিদার, কুকুরের মতো লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল কসাককে।

'দূর হ হতচ্ছাড়া আমার সামনে থেকে! তুই বেটা দেখছি কসাক নস, মেয়েমানুষের অধম। ভাগ বলছি সামনে থেকে, নয়তো তোর কপালে দুঃখ আছে ... আর তোরাই-বা অমন দাঁড়িয়ে পড়লি যে হারামজাদার দল? নাকি আমি আর তোদের জমিদার নই? এমন দেখান দেখাব যে তোদের চোদ্দপুরুষেও কেউ কখনো দেখিসনি!...'

অপানাস উঠে দাঁড়াল যেন একটা আঁধার মেঘ, রোমানের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। রোমান ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, বন্দুকে ভর দিয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি।

বান্দুরাটা দিয়ে কসাক বাড়ি মারল গাছে— খানখান হয়ে গেল বান্দুরা, শুধু তার গোঙানিটা ভেসে গেল বন দিয়ে।

বলে, 'তাই হোক, যে লোক হিতবাক্য শুনতে চায় না তাকে পরলোকের শয়তানেরাই শেখাক তাহলে। হুজুরের দেখছি বিশ্বাসী লোকের দরকার নেই।'

জমিদার জবাব দেবার আগেই অপানাস জিনে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া হাঁকাল। লোক-লস্কররাও সবাই চেপে বসল ঘোড়ায়। রোমানও কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে চলতে লাগল, শুধু ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় অক্সানাকে বলে গেল :

'ছেলেটাকে শুইয়ে দে অক্সানা, ঘুমোবার সময় হয়েছে। আর জমিদারবাবুর জন্যেও বিছানা পেতে দে।'

সবাই ওই একই পথ দিয়ে বনে চলে গেল; জমিদার এসে ঢুকল ঘরে; বাইরে, গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়ে রইল শুধু তার ঘোড়াটা। এদিকে অন্ধকার ঘনাতে লেগেছে, বনে চলেছে শনশনানি, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, ঠিক এই আজকের মতো... অক্সানা আমায় শোয়াল বিচালিঘরে, রাত্রের জন্যে ক্রুশচিহ্ন দিল... শুনি, অক্সানা কাঁদছে।

ওই গো, আমি ছোটছেলে, চারপাশে কী যে হচ্ছে কিচ্ছু বুঝিনি! বিচালিগাদায় গুটিসুটি শুয়ে শুনতে লাগলাম বনে কেমন গান শুরু হয়েছে ঝড়ের, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হাঁ গো! হঠাৎ শুনি, বাড়ির কাছে কে যেন ঘোরাফেরা করছে... গাছটার কাছে গিয়ে জমিদারের ঘোড়া খুলে দিল। ঘোঁৎঘোঁৎ করে ডেকে উঠল ঘোড়াটা, খুরের শব্দ উঠল; বনের দিকে চলে যেতেই শব্দটাও মিলিয়ে গেল... পরে শুনি, ফের কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, প্রায় বাড়ির কাছাকাছি। সোজা বাড়ি পর্যন্ত এসে জিন থেকে নামল লোকটা, দাঁড়াল একেবারে জানালার কাছে।

'হুজুর, হুজুর!' বুড়ো বগদানের গলা শুনলাম, 'শিগগির দরজা খুলুন গো! হারামজাদা কসাকটার মতলব খারাপ, আপনার ঘোড়াটাকে বনে ছেড়ে দিয়েছে।'

বুড়ো কথাটা বলতে-না-বলতেই কে যেন তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। ভয় পেয়ে গেলাম আমি, শুনলাম, ধপাস করে কী যেন পড়ল ...

দরজা খুললে জমিদার, বন্দুক হাতে ছুটে বেরুল, বেরুতেই বারান্দায় তাকে জাপটে ধরল রোমান, সোজা একেবারে ঝুঁটি ধরে আছড়ে ফেলল মাটিতে.... জমিদার দেখে গতিক খারাপ, বলে :

'ওই রোমান, ছেড়ে দে রে, আমার উপকারের বদলে এই হল তোর কৃতজ্ঞতা?'

রোমান বলে :

'খুব মনে আছে শালার জমিদার, কী উপকারই তুমি করেছ আমার, আমার বউয়ের। এবার তোমার উপকারের শোধ দিচ্ছি দাঁড়াও....'

জমিদার ফের বলে :

'অপানাস, তুই আমার বিশ্বাসী লোক! বাঁচা আমায়! আমি যে তোকে আপন ছেলের মতো দেখতাম।'

অপানাস জবাব দেয় :

'নিজের বিশ্বাসী দাসকে তুমি কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার ভালোবাসা সে হল চাবুকের ভালোবাসা পিঠকে, এবার বোঝে পিঠের ভালোবাসা চাবুককে... কত সাধ্যসাধনা, কাকুতি মিনতি করেছিলাম তুমি তো শোনোনি...'

জমিদার তখন অক্সানার কাছে মিনতি করতে লাগল :

'বাঁচা আমায় অক্সানা, তোর তো দয়ামায়া আছে।'

হাত নেড়ে ছুটে চলে গেল অক্সানা :

'আমি যে হুজুর তোমায় কত মিনতি করলাম, পা জড়িয়ে ধরে বললাম, দয়া করো গো, আমার এ সোমত্ত রূপকে দয়া করো, স্বামীর ঘরণী আমি, আমার মান নিয়ো না। দয়া তো করলে না, এখন নিজেই মিনতি করছ... হাই গো, পোড়াকপাল আমার, করি কী?'

জমিদার ফের চেঁচায়, 'ছেড়ে দে বলছি, আমার জন্যে তোদের সবকটাকে গিয়ে মরতে হবে সাইবেরিয়ার কয়েদে...'

অপানাস বলে, 'আমাদের জন্যে ভাবনা কোরো না হুজুর, রোমান তোমার লস্করদের আগেই গিয়ে পৌঁছবে জলায় আর আমি, হুজুরের দয়ায়, সংসারে আমি

একা, নিজের গর্দান নিয়ে আমার ভাববার কিছু নেই। ঘাড়ে বন্দুক ঝুলিয়ে চলে যাব বনে ... কিছু চালাক চতুর ছোকরা জুটিয়ে আড্ডা জমাব.... রাত হলে বন থেকে বেরিয়ে আসব সড়কে, মাঝে মাঝে গ্রামে হাজির হব, হানা দেব সোজা একেবারে জমিদারদের বাড়িতে। এই রোমান, তোল্ জমিদারকে, দয়াবতারকে দিয়ে আসি বৃষ্টির দয়ায়।'

কিল-ঘুষি চালায় জমিদার, চেঁচায় আর রোমান তাতে শুধু ভালুকের মতো কীসব বিড়বিড় করে আর কসাক টিটকারি দেয়। এই করে তো চলে গেল ওরা।

আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। সোজা ছুটে গেলাম ঘরের মধ্যে অক্সানার কাছে। অক্সানা বসে আছে চৌকিতে, মুখখানা দেয়ালের মতো ফ্যাকাসে...

ওদিকে বনে ততক্ষণে গুরুগুরু করে উঠেছে সত্যিকারের ঝড়, নানা গলায় হাঁক দিচ্ছে গাছের ঝাড়, বাতাস গজরাচ্ছে, বাজ ডাকছে থেকে থেকে। অক্সানা আর আমি তক্তপোশে বসে আছি, হঠাৎ শুনি বনের মধ্যে কে যেন গুঙিয়ে উঠল। ওই গো, এমন করুণ গোঙানি, যে মনে হলেই আজো পর্যন্ত বুকের ভেতরটা ভার হয়ে আসে, অথচ ঘটনাটা কতদিন হয়ে গেল...

বললাম, 'অক্সানা গো, বনে ও কার গোঙানি?'

অক্সানা আমায় কোলে নিয়ে দোলা দিতে লাগল।

বলে, 'ঘুমো বাছা, ও কিছু নয়! ও এমনি... বনের আওয়াজ!'

আর সত্যিই আওয়াজ ছাড়ছিল বন, ওহ্, সে কী আওয়াজ!

আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমরা; শুনি, বনে যেন বন্দুকের আওয়াজ।

বললাম, 'অক্সানা গো, বন্দুক ছুড়ছে কে?'

আর অক্সানা বেচারি, কেবলি আমায় দোলা দেয় আর বলে :

'চুপ কর বাছা, চুপ করে থাকো, ও কিছু নয়, বনের দেবতা বাজ হানলেন।'

আর কেবলি দোলা দেয় আমায়, বুকের মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে রাখে, ঘুমপাড়ানি গান গায় :

'বন ডাকে গো, বন ডাকে, খোকনমণির বন ডাকে....'

আমি তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়লাম...

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি রোদ ঝলকাচ্ছে। ঘরের মধ্যে একা অক্সানা পোশাকআশাক পরেই ঘুমিয়ে আছে। আগের দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ল, ভাবলাম : ও সবই বোধহয় স্বপ্ন।

কিন্তু সে তো স্বপ্ন নয় গো, হাই বাপ! স্বপ্ন নয়, সবই সত্যি। ঘর থেকে ছুটে বেরোলাম আমি, ছুটে গেলাম বনে, কিচিরমিচির করছে পাখিপাখালি, পাতায় পাতায় টলমল করছে শিশির। ছুটে গেলাম গাছের ঝাড়ের দিকে, সেখানে দেখি জমিদার আর হেড বরকন্দাজ শুয়ে আছে পাশাপাশি। জমিদারের মুখখানা শান্ত,

ফ্যাকাসে, আর বরকন্দাজের চুলদাড়ি সব পায়রার মতো সাদা, মুখের ভাবটা কিন্তু কড়া, যেন জীবন্ত। দুজনেরই বুকের উপর রক্ত।

*　　*　　*

বুড়ো মাথা নিচু করে চুপ করে গেল দেখে জিগ্যেস করলাম, 'আর অন্যদের কী হল?'

'হাঁ গো! কসাক অপানাস যা বলেছিল তাই সব হল। অনেকদিন বনে কাটিয়েছিল সে, দলবল নিয়ে হানা দিত বড় সড়কে, একেবারে তোমার যত জমিদারবাড়িতে। কসাকের এ ভাগ্য যে ওদের বংশেরই ধারা : বাপ-ঠাকুর্দারা গাইদামাচিনার হাঙ্গামা চালিয়েছিল, ওর কপালেও তাই হল। আমাদের এই ঘরেই, ছেলে, আসত সে, প্রায়ই আসত যখন রোমান বাড়ি থাকত না। আসত, বসে বসে গান গাইত, বান্দুরা বাজাত। দলবল নিয়ে এলে অক্সানা আর রোমান সর্বদাই তাদের আপ্যায়ন করত। তবে ছেলে, সত্যিকথা যদি তোকে বলতে হয় তবে হ্যাঁ, পাপ-পাতক না ছিল তা নয়। এই তো বন থেকে মাক্সিম আর জাখার এখনই আসবে, এরা তো আর ছেলে নয়, ওদের নাতি, তা দেখিস তুই দুটির দিকে চেয়ে : আমি ওদের কিছু বলিনি, তবে রোমান আর অপানাসকে যারা দেখেছে তারাই বলবে, কোন্‌টি কার মতো, এই হল গে ছেলে-বৃত্তান্ত, এই বনে আমার যা দেখা...'

ওদিকে রীতিমতো ডাক ছেড়েছে বন— ঝড় উঠবে!

৩

কাহিনীর শেষ কথাগুলো বুড়ো বলল কেমন ক্লান্তস্বরে। বোঝা যায়, অতীতের স্মৃতিচারণে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে : কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, মাথা কাঁপছে, জল এসে পড়ছে চোখে।

সন্ধ্যা নেমে এল পৃথিবীতে, অন্ধকার হয়ে এল বন, ঘরের চারপাশে গাছগাছালির তরঙ্গ ছুটল উত্তাল সমুদ্রের মতো। বৃক্ষচূড়ার দুলুনি যেন দুর্যোগের দিনের ফেনিল ঢেউয়ের চুড়ো।

কুকুরের ফুর্তির ডাক শুনে বোঝা গেল ঘরের কর্তারা ফিরছে। দুজনেই দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল কুঁড়ের কাছে। তাদের পেছন পেছন হাঁপাতে হাঁপাতে হারানো গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে মত্রিয়া। আমাদের পুরো দলটাই জমায়েত হল।

কিছুক্ষণ পরেই বসা গেল ঘরের ভেতর : চুল্লিতে সানন্দে আগুন জ্বলছে; মত্রিয়া 'সাঁঝের খাওয়ার' আয়োজনে লাগল।

জাখার-মাক্সিমকে এই প্রথম দেখছি তা নয়, তাহলেও এবার তাদের দিকে তাকালাম একটা বিশেষ কৌতূহল নিয়ে। জাখারের মুখখানা কালচে, ভয়ানক

নিচু কপাল থেকে বেরিয়ে আছে ভুরু, চাউনিটা কেমন গোমড়ামতো, যদিও মুখ দেখে তার ভেতরকার একটা অন্তর্নিহিত ভালোমানুষি শক্তি বেশ টের পাওয়া যায়। মাক্সিমের চাউনিটা খোলামেলা, তার ধূসর চোখজোড়া যেন সবকিছুকেই আদর করতে চায়। মাঝে মাঝে সে তার কোঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকিয়ে হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তোলে।

মাক্সিম বলল, 'বুড়ো আমাদের ঠাকুর্দার আমলের গল্প কিছু শোনাল নাকি?'

বললাম, 'হাঁ শোনাল।'

'ওই রকমই লোক বটে! বন যেই একটু কড়ারকম ডাক ছাড়ে, অমনি যত পুরনো কথা তার মনে পড়ে। এবার সারারাত আর তার ঘুম আসবে না।'

'একেবারে ছেলেমানুষ,' বুড়োর জন্যে বাঁধাকপির সুপ এগিয়ে দিয়ে বললে মত্রিয়া।

বুড়ো যেন ঠিক বোঝেনি যে কথাটা তাকে নিয়েই। একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল সে, থেকে থেকে অকারণে মাথা নেড়ে হাসছিল; শুধু যখন বনের উন্মত্ত বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়ছিল কুঁড়ের উপর, তখন সে শঙ্কিত হয়ে উঠছিল, ভীতদৃষ্টিতে কান পেতে শুনছিল কী যেন।

অচিরেই সবাই চুপ হয়ে এল। টিমটিম করে জ্বলছে প্রদীপের নিভন্ত আলো, একটানা বেড়ে চলেছে ঝিঁঝিঁর ডাক... আর বনে যেন শুরু হয়েছে হাজার হাজার প্রচণ্ড ভাঙা গলায় অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কী একটা যোগসাজশের আলাপ। মনে হল যেন কী এক করাল শক্তি শোরগোল তুলে এক জমায়েত বসিয়েছে বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এই শোচনীয় চালাটার উপর চারিদিক থেকে হামলা করবে বলে। থেকে থেকে ঘোলাটে গর্জনটা চড়া হয়ে বেড়ে উঠে আছড়ে পড়ে, তখন থরথর করে ওঠে দুয়ারটা, মনে হয় ক্রোধোন্মত্ত কে যেন এসে হিসিয়ে উঠছে, করাঘাত করছে, আর চিমনিতে নৈশ ঝড়ের তীক্ষ্ণ শাসানি যেন আকুল সুর তুলছে বুকের মধ্যে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে থেমে আসে ঝড়, করাল স্তব্ধতায় জর্জরিত হয়ে ওঠে সশঙ্ক হৃদয়, তারপর ফের শুরু হয় কলরোল, মনে হয় যেন বুড়ো পাইনগাছ ষড়যন্ত্র করেছে হঠাৎ ভূমিত্যাগ করে নৈশ ঝঞ্ঝার ঝাপটের সঙ্গে উড়ে যাবে কোন্ অদৃষ্ট দিগন্তরে।

কিছুক্ষণের জন্যে অস্পষ্ট তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, তবে মনে হয় বেশিক্ষণের জন্যে নয়। নানা কণ্ঠে নানা স্বরে ঝড় ফুঁসছে। প্রদীপটা মাঝে মাঝে দপদপিয়ে উঠে ঘরখানাকে আলো করে তুলছিল। বুড়ো তার চৌকিতে বসে বসে হাতড়াতে হাতড়াতে চারপাশে কী যেন খুঁজছিল, যেন কাছাকাছি আপন কাউকে পেতে চায় সে। বেচারির মুখখানায় ভয় আর প্রায় একটা শিশুসুলভ অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছে।

কানে এল তার করুণ অভিযোগ, 'অক্সানা গো, বনে কে গোঙাচ্ছে, বলো না?'

আতঙ্কে হাত কাঁপিয়ে সে কান পেতে শুনল।

তারপর ফের বলল, 'না গো, গোঙানি কোথায়। বনে ও তো ঝড়ের আওয়াজ, আর কিছু নয়, আওয়াজ তুলেছে বন ...'

আরো কিছুক্ষণ কাটল। ছোট জানালার কাচে বিদ্যুতের নীলাভ ঝলক দেখা গেল, জ্বলে উঠল মহাকায় গাছগুলোর অপ্রাকৃত রেখা, পরমুহূর্তে ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল তমসায়। কিন্তু এই খর ঝলকে মুহূর্তের জন্যে মরে গেল প্রদীপের ম্লান শিখাটা আর বনের মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে উঠল একটা দূর বজ্রপাতের আচমকা গর্জন।

বুড়ো ফের সভয়ে ছটফটিয়ে উঠল চৌকিতে।

'অক্সানা গো, বনে বন্দুক ছুড়ছে কে, বলো না?'

'ঘুমো, বুড়ো, ঘুমো,' চুল্লির কাছ থেকে ভেসে এল মত্রিয়ার শান্ত কণ্ঠস্বর, 'চিরকাল ওই এমনি : ঝড় উঠলে রাতে কেবলি ও অক্সানাকে ডাকবে। মনেই নেই যে অক্সানা কতকাল পরলোকে চলে গেছে!

হাই তুলল মত্রিয়া, ফিসফিস করে প্রার্থনা করে নিল, ঘরের মধ্যে আবার স্তব্ধতা নেমে এল, সে স্তব্ধতায় ছেদ পড়ছিল কেবল ঝড়ের শব্দে আর বুড়োর ভীত বিড়বিড়ানিতে :

'বনের আওয়াজ, ডাক ছাড়ছে বন.... অক্সানা গো....'

অচিরেই তুমুল বর্ষণ শুরু হল, বৃষ্টির কলরোলে চাপা পড়ে গেল বাতাসের আর্তনাদ আর পাইনবনের গোঙানি...

১৮৮৬

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841801841510